সভ্যতার উত্থান পতন ও আলকোরআন

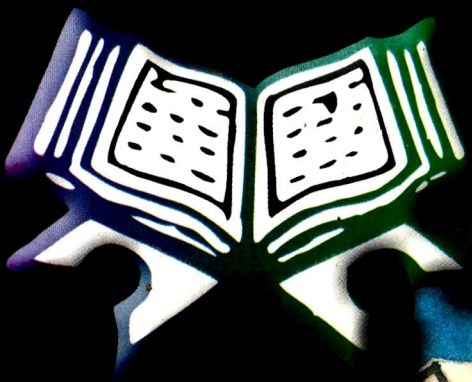

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

সভ্যতার উত্থান পতন
ও
আলকোরআন

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ
এস. এ. মুকুল
২৯৮, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।
মোবাইল ঃ ০১৭১৬-২০৯২২৪

প্রকাশকাল ঃ
মে-২০১১
জামাদিউল আউয়াল-১৪৩২ হিজরী
বৈশাখ-১৪১৮ বাংলা

স্বত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ ঃ
নবযুগ প্রেস এন্ড কম্পিউটার্স
২৯৮, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।
মোবাইল ঃ ০১৮২২-৮৪৪২১১
ঃ ০১৮২৪-৫৬২১১৬
ঃ ০১৯১৫-৬৫৯৫৫৬

প্রচ্ছদ ডিজাইন ঃ
পলাশ উদ্দিন

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৮০.০০ টাকা
বোর্ড বাধাই ঃ ১০০.০০টাকা

পরিবেশক ঃ
আল-মাদানী এন্টারপ্রাইজ
(খুলনা আলীয়া মাদরাসা গেট সংলগ্ন)
খানজাহান আলী রোড, খুলনা।
মোবাইল ঃ ০১৮২৭-৫২৪৩৯৬

www.pathagar.com

"এই (নির্বোধ) ব্যক্তিরা কি দেখেনি যে, তাদের আগে আমি এমন বহু জাতি ও তাদের জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি (যারা খুব শক্তিশালী ছিলো), পৃথিবীতে যাদের এমনভাবে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলাম যা তোমাদেরও করিনি। আকাশ থেকে তাদের ওপর আমি প্রচুর বৃষ্টি বর্ষন করেছি, আবার তাদের (মাটির) নীচ থেকে (পানি সরবরাহের জন্যে) আমি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দিয়েছি। অতপর (যখন তারা আমার এসব নেয়ামতকে অস্বীকার করেছে, তখন)আমি তাদের এই পাপের জন্য (চিরতরে) ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের (ধ্বংসের) পর (তাদের জায়গায়) আমি আবার (সম্পূর্ণ এক) নতুন জাতির উত্থান ঘটিয়েছি।"

(আলকোরআন)

www.pathagar.com

উৎসর্গ

নতুন পৃথিবী ও

আলোকিত সভ্যতা নির্মাণে

সদা তৎপর

মুক্তিকামী জনতার

উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

www.pathagar.com

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ। কিছুটা বিলম্বে হলেও **'সভ্যতার উত্থান পতন ও আলকোরআন'** শীর্ষক লেখাটি প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। ছোট ভাই এস. এ. মুকুল এটির প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

'সভ্যতার উত্থান পতন ও আলকোরআন' সভ্যতার পালা বদলের যুগ সন্ধিক্ষণে একটি ক্ষুদ্র উদ্যোগ। এখানে অতি ক্ষুদ্র পরিসরে মানব জাতির ইতিহাসে সভ্যতার বিবর্তন, উত্থান-পতন ও নতুন সভ্যতার গঠন সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। আজকের পৃথিবী পরিবর্তন চায়। জনগণ নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রত্যাশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষার প্রহর গুনছে। তারা ইহুদী প্রভাবিত পাশ্চাত্যের নেতৃত্বাধীন শোষন ও জুলুমমূলক বস্তুবাদী সভ্যতার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়। আর তা হতে পারে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জাগরনের মাধ্যমে। আর হতে হবে অহিংস, শান্তিপূর্ণ ও বিশ্বব্যাপক। এ জন্য প্রয়োজন দেশ-কালের গন্ডি পেরিয়ে একটি কালজয়ী আদর্শ। আর এ আদর্শ হতে পারে কোরআন ও ইসলাম। আল্লামা জালালউদ্দিন আল সুয়ুতীর ভাষায়–"The Quran is Islam".

অতীতে কোরআনের ভিত্তিতেই বিশ্বব্যাপক ইসলামী সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। কোরআন আজও তার প্রাণশক্তিসহ বিদ্যমান। বিশ্বের দেশে দেশে কোরআনের অনুসারীর সংখ্যা ১৫৭ কোটি। পৃথিবীর আনাচে কানাচে তাদের বাস। প্রতিনিয়ত তাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। দীর্ঘ অবকাশের পর তারা আবার জেগে উঠেছে। এমতাবস্থায় বর্তমান বস্তুবাদী সভ্যতার সাফল্য ও ব্যর্থতা সমূহ চিহ্নিত করে নিজেদের কর্তব্যকর্ম নির্ধারণ করতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে মহাগ্রন্থ আল-কোরআনই হতে পারে প্রধান চালিকাশক্তি ও যাবতীয় নীতি নৈতিকতার উৎস এবং প্রেরনার কেন্দ্রবিন্দু। আমার বিশ্বাস 'সভ্যতার উত্থান পতন ও আলকোরআন' এ ক্ষেত্রে কম বেশী সহায়ক হতে পারে।

আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের আন্তরিক প্রকাশ এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। বিশ্বজগতের প্রভু মহান আল্লাহর নিকট একান্ত প্রার্থনা তিনি যেন আমার এ প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। আর যেসব ভুল ভ্রান্তি হয়েছে তা ক্ষমা করেন।

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক (ইংরেজী)
মধ্যপাড়া মসজিদ রোড,
বয়রা, খুলনা।

তারিখ ঃ
মে-২০১১ ঈসায়ী

www.pathagar.com

সূচীপত্র

- ☐ **মানুষের উৎপত্তি ও কোরআন** ৭
  - ❖ বিবর্তনবাদ ও মানুষের আবির্ভাব
  - ❖ মানুষের উৎপত্তি বিষয়ে আধুনিক ধারনা
- ☐ **জাতি সমূহের সৃষ্টি ও আলকোরআন** ১৩
- ☐ **সভ্যতার বিকাশ ও আলকোরআন** ১৬
  - ❖ প্রাচীন সভ্যতা ঃ (ক) পাথরের যুগ (খ) ধাতুর যুগ
  - ❖ প্রাচীন সভ্যতা সমূহের বিকাশ স্থান
  - ❖ প্রাচীন সভ্যতা সমূহের সমাজ চিত্র
  - ❖ কোরআনের দৃষ্টিভংগী
  - ❖ সভ্যতার মধ্য যুগ
  - ❖ সভ্যতার আধুনিক যুগ
- ☐ **সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং কোরআন** ২৮
  - ❖ সংস্কৃতি ও সভ্যতার তত্ত্ব
- ☐ **সভ্যতার উত্থান-পতনের কোরআনী দর্শন** ৩৬
  - ❖ সভ্যতার উত্থান ও কোরআনী দর্শন
  - ❖ সভ্যতার পতন
  - ❖ পতনের কোরআনী দর্শন
- ☐ **আলকোরআনের পাতায় সভ্যতার উত্থান-পতন** ৪৭
  - ❖ হযরত নূহ (আঃ) এর জাতির ধ্বংস
  - ❖ আদ জাতির বিলুপ্তি
  - ❖ সামূদ জাতির ধ্বংস
  - ❖ লূত জাতির ধ্বংস
  - ❖ ইবরাহীম (আ) এর নবুয়াতের ধারায় সভ্যতার উত্থান-পতন
  - ❖ বনি ইসরাঈলের উত্থান ও পতন
  - ❖ হযরত ঈসা (আ) এর নবুয়াত ও খ্রিষ্টবাদের উত্থান
- ☐ **ইসলামী সভ্যতার অভ্যুদয় ও কোরআন** ৬৮
  - ❖ ইসলামের আবির্ভাবকালীন আরব ও বিশ্বব্যবস্থা
  - ❖ ইসলামের জন্য আরব ভূমি বাছাইয়ের রহস্য
  - ❖ হযরত মুহাম্মদ (সা) এর নবুয়াত ও ইসলাম প্রচার
  - ❖ খোলাফায়ে রাশেদুন
  - ❖ উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে মুসলিম শাসন বিস্তার
  - ❖ কোরআন ও ইসলামী সভ্যতা
- ☐ **মুসলমানদের পতন** ৮১
- ☐ **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ** ৮৫
- ☐ **মানব জাতির ভবিষ্যত ও ইসলাম** ৯২

www.pathagar.com

মানুষের উৎপত্তি ও কোরআন

পৃথিবীতে মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে আলকোরআনের প্রাথমিক ঘোষনা, "আল্লাহ তায়ালা যখন ফেরেস্তাদের (সম্বোধন করে) বললেন ঃ আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি (খলীফা) পাঠাতে চাই।" অতপর মহান আল্লাহ তাঁর ঘোষনা মোতাবেক আদম (আঃ) কে পৃথিবীর প্রথম মানুষ হিসেবে তৈরী করলেন। এ সম্পর্কে কোরআনে আল্লাহ তায়ালা ঘোষনা করেন," স্মরণ কর যখন তোমার মালিক ফেরেস্তাদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আমি মাটি থেকে অচিরেই মানুষ তৈরী করতে যাচ্ছি। তাদের আমি আরও বলেছি, যখন তাকে সম্পূর্ন বানিয়ে সুঠাম করে নেবো এবং ওতে আমার পক্ষ থেকে রুহ তথা জীবনের সঞ্চার করবো তখন তোমরা আনুগত্যের নিদর্শন হিসেবে তার প্রতি সেজদাবনত হয়ো। অতপর যখন সে কাঠামোকে আমি মানুষে পরিনত করলাম তখন ফেরেস্তারা সবাই একে একে সেজদা করলো একমাত্র ইবলিস ছাড়া।" অবশেষে এক মহাপরীক্ষা শেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতিনিধি আদমকে (আ) তার স্ত্রীসহ পৃথিবীতে প্রেরন করেন। আর এভাবেই মহাজগতের মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও পরিকল্পনা মোতাবেক পৃথিবীতে মানুষের উৎপত্তি ঘটলো।

যারা ঈমানদার ও প্রকৃত জ্ঞানী তাদের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে আল্লাহর এ ঘোষনাই যথেষ্ট। তারা কোন প্রকার সন্দেহ - সংশয়ে লিপ্ত না হয়ে আল্লাহর এ ঘোষনাকে মেনে নিয়েছে। কিন্তু সব মানুষের চিন্তা সব সময় সরল রেখায় চলে না। যারা সন্দেহবাদী, আল্লাহতে অবিশ্বাসী, তারা কোরআনের এ ঘোষনায় আস্থা স্থাপন করে নাই। তারা মানুষ ও পৃথিবীর উৎপত্তি, মহাবিশ্বের সৃষ্টি, পৃথিবীতে উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর আবির্ভাব ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাদের চিন্তা গবেষনা অব্যাহত রাখে এবং আজও অব্যাহত আছে। এসব গবেষনার ফলাফল হিসেবে কিছুটা মত পার্থক্য সত্বেও অধিকাংশ আধুনিক বিজ্ঞানী পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে **Big Bang** বা মহাবিস্ফোরন তত্ত্বকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাদের মতে প্রায় ১৫০০ কোটি বছর আগে এক মহাবিস্ফোরনে এ বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের জন্ম হয়। অবশ্য এ বিষয়ে এখনো গবেষনা চলছে। আল-কোরআনের সুরা আম্বিয়ার ৩০নং আয়াতে বর্ণিত তথ্যের সংগে **Big Bang** তত্ত্বের মিল দেখা যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

"এরা কি দেখেনা যে, আসমান সমূহ ও পৃথিবী (এক সময়) ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিলো, অতপর আমিই এদের উভয়কে আলাদা করে দিয়েছি, আমি প্রাণবান সবকিছুকেই পানি থেকে সৃষ্টি করেছি।"

www.pathagar.com

বিবর্তনবাদ ও মানুষের আবির্ভাব

মানুষের উৎপত্তি নিয়ে চিন্তা-গবেষনার এক পর্যায়ে নৃতাত্বিক বিজ্ঞানীগন একটি মতবাদ দাঁড় করান, আর তা হলো **'বিবর্তনবাদ'**। এই মতবাদের প্রবক্তাদের মত অনুসারে,-কোন প্রাণী খাড়া হয়ে দুপায়ে ভর দিয়ে চলাফেরা করতে পারলে, তার মগজের পরিমান ১৫০০ সিসি এর মত হলে এবং হাতের সাহায্যে কাজ করলে তাকে মানুষের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে, তবে এটাই শেষ কথা নয়। শুধুমাত্র দৈহিক বৈশিষ্ট্যই নয়, মানুষের কর্মকান্ড তথা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য দেখেও মানুষকে সনাক্ত করা যায়।

এ মতবাদ অনুসারে আজকের বিশ্বে বসবাসরত আধুনিক মানুষ এ স্তরে পৌঁছেছে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। তাদের মতে প্রাগৈতিহাসিক কালের মানুষকে চিনতে হলে আমাদেরকে ফসিল থেকে প্রমান খুঁজতে হয়। পৃথিবীর প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের যে খোঁজ মানুষ লাভ করেছে তাতে দেখা গেছে যে, পৃথিবীতে মানুষ এসেছে অন্য সব প্রাণীর পরে। তাদের এ কথা মেনে নেয়া যায়, কারণ মানুষের আগে পৃথিবীতে জ্বিন জাতি বাস করতো এবং আল্লাহপাক ঘোষনা করেছেন তিনি জগতের সকল সৃষ্টি মানুষের কল্যানে নিয়োজিত করেছেন।

মানুষের আজকের পর্যায়ে পৌঁছা সম্পর্কে বিবর্তনবাদীরা আরও বলেন যে, মানুষের আবির্ভাবের আগে যেসব প্রাণী পৃথিবীতে এসেছে তাদের পর্যায়ক্রমে উন্নতির ছাপও শিলাস্তরে রয়েছে। পূর্ববর্তী ধাপের প্রাণীদের চেয়ে উন্নত ধরনের প্রাণীরা বাস করতো পরবর্তী ধাপে। অর্থাৎ কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রাণীদের মধ্যেও পরিবর্তন এসেছিল। উন্নতি প্রক্রিয়ার শেষ ধাপে মানুষের উৎপত্তি ঘটে। আর মানুষের উৎপত্তি ঘটে বানর (ape) থেকে। আর এ বানরের রয়েছে ৪টি প্রজাতিঃ (১) গরিলা (২) শিম্পাঞ্জি (৩) ওরাং ওটাং এবং (৪) গিবন। এরা মানুষের আত্মীয়। এ সব নৃবিজ্ঞানীর মতে বানর মানুষদের থেকে আধুনিক মানুষের উৎপত্তির বয়স সর্বোচ্চ ৫০ হাজার বছর। অতএব দেখা যায় বিবর্তনের ইতিহাস অনেক প্রাচীন।

বিবর্তন (evolution) কথাটা প্রথম বারের মত ব্যবহার করেন হার্বাট স্পেনসার। তার মতে, ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনের মাধ্যমে সরল থেকে জটিল অবস্থায় উপনীত হওয়াটাই বিবর্তন। আধুনিক ধারা অনুযায়ী অতি সরল দেহ থেকে অবিরাম ও ধারাবাহিক অথচ খুব ধীর গতির পরিবর্তনের মাধ্যমে জটিল দেহ বা অঙ্গের উদ্ভবকে বিবর্তন বলা যায়।

বিবর্তন সম্পর্কে গ্রীক সভ্যতার যুগে খ্রিষ্টপূর্ব ৩২২ সালের আগে এ্যারিষ্টোটল বলেছিলেন, প্রথমে শুধু জড় বস্তু ছিল। তারপর উদ্ভিদের সৃষ্টি

www.pathagar.com

হয়েছে। এরপর এসেছে প্রাণী। নিচু শ্রেণী থেকে ক্রমশ রুপান্তরের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে মানুষ। কিন্তু কোরআনের আলোকে এ্যারিস্টোটলের এ মতবাদ গ্রহনযোগ্য নয়। কোরআনের বাণী ঃ

" তিনিই (আল্লাহ) তোমাকে (মানুষ) সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে (পরিমান মত যাবতীয় উপাদান দিয়ে সুঠাম ও) সুবিন্যস্ত করে বানিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছামত যে ভাবেই চেয়েছেন সেই আঙ্গিকেই তোমাকে গঠন করেছেন।"(ইনফিতার ঃ ৭-৮)

"অবশ্যই আমি (আল্লাহ) মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি (এর সর্বোৎকৃষ্ট ও) সুন্দরতম অবয়বে"। (আত্ তীন ঃ ৪)

"তিনি মানুষ বানিয়েছেন। (অতপর মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য) তিনি তাকে কথা বলতে শিখিয়েছেন।" (আর রহমান ঃ ৩-৪)

আলকোরআনের এহেন সুস্পষ্ট ঘোষনা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমরা কি বিশ্বাস করব যে, আমরা মানুষরা বানর, গরিলা কিংবা শিম্পাঞ্জির বিবর্তিত রুপ অর্থাৎ আধুনিক সংস্করণ! না, কোন জ্ঞানবান, বিবেকবান মানুষ তার নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে এহেন নিচ ও অমর্যাদাকর তত্ত্ব বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নয়। ধর্ম বিশ্বাসী কোন মানুষ সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন নিজেকে বানর ভাবতে প্রস্তুত নয়।

এ্যারিস্টোটলের মতবাদের পর আমরা বিবর্তনবাদের ইতিহাসে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ডারউইনের মতবাদ সম্পর্কে জানতে চাই। এ সম্পর্কে ১৮৫৯ সালে তার একখানা বই প্রকাশিত হয়। বইটি আমাদের কাছে **অরিজিন অব স্পেসিস** নামে পরিচিত হলেও এর পুরো নাম **"দি অরিজিন অব স্পেসিস বাই মিনস অব ন্যাচারাল সিলেকশন অর দি প্রিজারভেশন অব ফেভারড্ রেসেস ইন দ্যা স্ট্রাগল ফর লাইফ"**। বইটির বাংলা অনুবাদ হলো ঃ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজাতির উদ্ভব বা আনুকুল্য প্রাপ্ত জাতি সমূহের বেঁচে থাকার সংগ্রামে টিকে থাকা।

ডারউইনের মতবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হলো-'প্রাকৃতিক নির্বাচন ও যোগ্যতমের টিকে থাকা'। এ মতবাদ অনুসারে জীবজগতে সর্বদাই অস্তিত্বের কঠিন সংগ্রাম চলছে। সেই সংগ্রাম তিন ধরনের হয়ে থাকে। এগুলো হলো ঃ

ক) এক প্রজাতির জীবের মধ্যে খাদ্য ও অন্যান্য সুবিধার জন্য কঠিন প্রতিযোগিতা হয়।

খ) ভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্যে খাদ্য ও অন্যান্য সুবিধার জন্যে পরস্পরের মধ্যে কঠিন সংগ্রাম চলে।

গ) পরিবেশের সাথে জীবদের অস্তিত্বের সংগ্রাম।

www.pathagar.com

জীব জগতের প্রতিটি প্রাণী কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত ডারউইনের এ মতবাদ অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কেননা জীবনের অপর নাম সংগ্রাম। কোরআনের ভাষ্য মতে, মানুষও কঠিন কঠোর সংগ্রামে রত। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাকে সংগ্রাম করে পথ চলতে হয়। এ প্রসঙ্গে কোরআনের বাণী ঃ "আমি প্রতিটি মানব শিশুকে এক কঠোর পরিশ্রম দিয়ে সৃষ্টি করেছি।" (বালাদ ঃ ৪)

কিন্তু এ পরিশ্রম ও সংগ্রামের অর্থ এ নয় যে, এর ফলে মানুষ সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে বানর হতে দৈহিক আকৃতি পরিবর্তন করে মানুষের রুপ পরিগ্রহ করেছে এবং জগতের সেরা সৃস্টির মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। যদি এ তত্ত্ব সত্য হয় তাহলে বিগত ৫০ হাজার বছরের ইতিহাসে বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ, ফেরেস্তা কিংবা তার থেকে উন্নত অন্য কোন সৃষ্টির আকৃতি ধারণ করতো। আর আমাদের চার পাশের বানর, শিম্পাঞ্জী, গরিলা ইত্যাদি মানুষ অথবা অন্য কোন জীবে রুপান্তরিত হতো। কিন্তু মানব জাতির জ্ঞাত ইতিহাস এ সম্পর্কে আমাদেরকে কোন প্রকার ইতিবাচক তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব ডারউইনের 'বিবর্তনবাদ' আদৌ বানর হতে মানুষের মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য কোন মতবাদ নয়। এ মতবাদ মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্থান ও পতনের ক্ষেত্রে আলোচনার দাবী রাখে।

মানুষের উৎপত্তির বিষয়ে আধুনিক ধারণা ঃ

দীর্ঘ দিন ধরে বিজ্ঞানীরা এ ধারণা লালন করে বলেছেন যে, জৈব বিবর্তনের ফলশ্রুতিতে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। এ সম্পর্কিত গবেষণা আজও চলছে। এ গবেষণা ও আলোচনার ইতিটানা হবে কিনা এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মাঝে অদ্যাবধি দ্বিধা দ্বন্দ বিরাজমান। তবে বিবর্তনবাদ তাদেরকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। অতএব পৃথিবীতে মানুষ কি করে এলো সে বিষয়ে আধুনিক মতবাদ জানার সময় খুবই প্রাসঙ্গিকভাবে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব সংক্রান্ত নানা মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে যেসব মতবাদ রয়েছে সংক্ষেপে সেগুলো হলো ঃ

১) অ্যাবারোজেনেসিস মতবাদ বা স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি তত্ত্ব।

২) অজৈব পদার্থ থেকে জীবনের সৃষ্টি।

৩) বায়োজেনেসিস মতবাদ অর্থাৎ আগেকার জীবসমূহ থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান জীবসমূহের সৃষ্টি।

৪) কসমোজোয়িক মতবাদ অর্থাৎ ভিন্ন গ্রহ থেকে জীবনের সৃষ্টি মতবাদ।

৫) পৃথিবীর বাইরে থেকে জীব প্রেরণ।

৬) বিপর্যয়বাদ অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার ফলে নব সৃষ্টির উদ্ভব।

www.pathagar.com

৭) বিশেষ সৃষ্টি মতবাদ অর্থাৎ স্রষ্টার ইচ্ছায় এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী ও উদ্ভিদকূলের আবির্ভাব ঘটেছে।

৮) **জৈব রাসায়নিক উৎস মতবাদ ঃ** রুশ বিজ্ঞানী এ, আই, ওপারিন ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে এই মতবাদ প্রকাশ করেন। প্রায় সব বিজ্ঞানী এই মতবাদকে সঠিক বলে মনে করেন। এই মতবাদে জীবন সৃষ্টির বিষয়ে পাঁচটি ধাপের উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো ঃ

ক) প্রাথমিক কাঁচামাল ঃ পানি ও নানা গ্যাসীয় পদার্থ।

খ) মনোমার সৃষ্টি ঃ কাচাঁমাল থেকে অ্যামাইনো এ্যাসিড, শর্করা প্রভৃতি জটিল মনোমার সৃষ্টি হয়েছিল।

গ) পলিমার সৃষ্টি ঃ মনোমার থেকে আমিষ ও নিউক্লেয়িক এ্যাসিডের মত পলিমার সৃষ্টি হয়েছিল।

ঘ) প্রাক জীবকণা সৃষ্টি ঃ সৃষ্ট পলিমার সমূহের সম্মেলনে প্রটোবায়ন্ট বা প্রাক জীবকণার সৃষ্টি হয়েছিল, যারা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বিভাজিত হয়েছিল।

ঙ) বংশ বিস্তারের সূচনা ঃ প্রোটোবায়ন্টগুলো থেকে সৃষ্ট নবতর প্রোটোবায়ন্টে আগেকার গুনাবলী ও বৈশিষ্ট্য ধারন সম্পন্ন হয়েছিল। প্রাকৃতিক পরিবেশে অভিযোজনের মাধ্যমে এখান থেকেই জীবের সৃষ্টি হয়েছিল।

পৃথিবীতে বিদ্যমান বিভিন্ন সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রাণের আবির্ভাব সংক্রান্ত উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলোর ভূমিকা থাকাটা অবিশ্বাস্য নয়। কেননা মহান আল্লাহ তায়ালা দীর্ঘকাল ব্যাপী পৃথিবী ও মহাকাশ এবং এগুলোর মাঝে বিদ্যমান জীব ও বস্তু নিচয় সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষের দেহ কাঠামো তৈরী করেছেন পৃথিবীর নানা প্রকার মাটিজাত উপাদানের সমন্বয়ে। এ সব উপাদানের অন্যতম হলো পানি। আর এ প্রসঙ্গে আল্লাহর ঘোষনা ঃ "আমি জীবন্ত সকল প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি (আল আম্বিয়া ঃ ৩০)।" মানব সত্বার দ্বিতীয় উপাদান হলো আল্লাহর রুহের অংশ বিশেষ। আর এখানেই অন্যান্য জীবজন্তু থেকে মানুষের পার্থক্য। পৃথিবীতে মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের আধুনিক মতবাদ সমুহের মধ্যে পৃথিবীর বাইরে থেকে জীব প্রেরণ এবং বিশেষ সৃষ্টি মতবাদ গ্রহনযোগ্য। কারণ মানুষ আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি এবং পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি। আল্লাহ তায়ালা নিজ তত্ত্বাবধানে মানব জাতির প্রথম সদস্য আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সংগিনীকে সৃষ্টি করে প্রথমত বেহেস্তে বাস করতে দিয়েছেন এবং পরবর্তীতে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তাই এ মতবাদটি কোরআনের সাথে অনেকাংশে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু মানুষ বস্তুর

www.pathagar.com

বিবর্তনের সর্বোচ্চ বিকশিত রূপ কোরআনের আলোকে এ মতবাদ আদৌ গ্রহনযোগ্য নয়। সাধারন বুদ্ধি -বিবেকও এক্ষেত্রে কোন প্রকার সাড়া দিতে অনিচ্ছুক। জানিনা বিজ্ঞানীরা কেন এমন একটি অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে এত অধিক মাতামাতিতে লিপ্ত।

এক্ষেত্রে তাদের আসল আপত্তি হলো যাবতীয় সৃষ্টির পিছনে একজন সুনিপুন স্রষ্টার অস্তিত্ব ও অবদান নিয়ে। দুনিয়াতে একটি আলপিনও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরী হয়নি। একজন মানুষও প্রজনন পদ্ধতির বাইরে জন্মলাভ করছে না। একটি গাড়ীও কারখানা এবং কারিগর ব্যতীত নির্মিত হচ্ছে না। অথচ বিজ্ঞানীদের দাবী মহাবিশ্ব আপনা থেকে অস্তিত্বমান এবং পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর অব্যাহত বিবর্তনের ফল। আল্লাহ কিংবা স্রষ্টা বলে কিছু নেই। এ সবই পাগলের প্রলাপ মাত্র। আর এ পাগলামীর পিছনে সক্রিয় দর্শন হলো আখেরাতের জীবনের প্রতি অবিশ্বাস। আখেরাতে বিশ্বাসের অর্থই হলো জবাবদিহিতা।

এ সব মানুষ নিজেরা পৃথিবীতে নিয়ন্ত্রনহীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত। তারা নিজেদেরকে এক ধরনের পশু বৈ অন্য কিছু মনে করতে নারাজ। তাই জীবনটাকে কেবলই উপভোগ করতে ইচ্ছুক। জবাবদিহিতা থাকলে তা সম্ভব নয়। তারা নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজ-কর্মের বিষয়ে অন্যদের নিকট হতে কঠোর জবাবদিহিতা প্রত্যাশা করলেও স্রষ্টার নিকট নিজেদের দায়বদ্ধ ভাবতে পারে না। এসব অবৈজ্ঞানিক ও অগ্রহনযোগ্য মতবাদের এটাই মূল রহস্য।

অতএব বিবর্তনবাদীদের দৃষ্টিতে মানুষ বস্তুর বিবর্তিত উত্তর পুরুষ-বানরের বংশধর। কোরআনের আলোকে সে আল্লাহর এক বিশেষ ও সুপরিকল্পিত সৃষ্টি। মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। পৃথিবীর সৃষ্টি যেমন কোন দূর্ঘটনার ফল নয়, তেমনি মানুষও বানরের বংশধর নয়। মানুষ তার প্রাথমিক সৃষ্টিতেও মানুষ ছিল এবং আজও মানুষ এবং ভবিষ্যতেও মানুষ হিসেবেই টিকে থাকবে। মৃত্যুর পরে পুনরায় যখন তাদেরকে জীবন্ত করা হবে তখনও তারা মানুষ হিসেবেই পূনর্জীবিত হবে। তাই পৃথিবীতে মানুষের উৎপত্তি সংক্রান্ত কোরআনের মতবাদ মেনে নেয়াই বিবেকের স্বাভাবিক দাবী। যারা তা মেনে নেন তারাই বিশ্বাসী আর তারাই সফলকাম।

www.pathagar.com

জাতি সমূহের সৃষ্টি ও আলকোরআন

আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী অনেক দেশ ও মহাদেশে বিভক্ত। এ সব দেশ ও মহাদেশে বাস করছে প্রায় ৫০০ কোটিরও বেশী আদম সন্তান। তাদের গায়ের রং, মুখের ভাষা ও শারীরিক গঠন বা আকার আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। এ সবের উপর ভিত্তি করে অসংখ্য গোত্র, সম্প্রদায় এবং জাতি গড়ে উঠেছে। এ সব জাতি গোষ্ঠির কোন কোনটি জনসংখ্যা ও ভৌগলিক এলাকার বিবেচনায় ছোট, আবার কোন কোনটি অনেক বড়। কেউ বাস করছে পৃথিবীর কোন এক ক্ষুদ্র এলাকায় আবার কেউ ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়। যদিও নানা বর্ণ ও আকার আকৃতির মানুষ বিশ্বময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করছে, জাতিগত দিক থেকে তাদের শ্রেণী বিভাগের সংখ্যা বেশী নয়।

মানুষের ভৌগলিক অবস্থান ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ ঃ আধুনিক কালে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা মানুষকে বাসস্থানের ভিত্তিতে ০৯ (নয়) ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো ঃ

১) **আফ্রিকান ঃ** আফ্রিকা মহাদেশের সাহারা মরুভূমির দক্ষিনভাগে এই প্রজাতির মানুষেরা বাস করে। এদেরকে নিগ্রোয়েডও বলা হয়।

২) **আমোরেন্ডিয়ান বা আমেরিকান ইন্ডিয়ান ঃ** এশিয়ান জাতি সমূহের সাথে এ জাতির বেশ সাদৃশ্য বিদ্যমান। রক্তের গ্রুপ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে এ মিল লক্ষনীয়।

৩) **এশিয় ঃ** এদেরকে মঙ্গোলয়েডও বলা হয়। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন,তাইওয়ান ও জাপানের দ্বীপাঞ্চলে এদের বাস। ইউরোপিওদের চেয়ে এরা খাটো হয়ে থাকে।

৪) **অষ্ট্রেলিয়ান ঃ** অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে এদের বসবাস। এদেরকে অষ্ট্রালয়েড বা অষ্ট্রেলীয় আদিবাসিও বলা হয়।

৫) **মেলানেশিয় ঃ** অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর পূর্ব দিকের নিউগিনি, নিউব্রিটেন ও সলোমান দ্বীপপূঞ্জে মেলানেশিয়দের বাস। আফ্রিকানদের সাথে এদের গায়ের রংয়ের মিল দেখা গেলেও রক্তের গ্রুপ আলাদা।

৬) **পলিনেশিয় ঃ** প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপূঞ্জে পলিনেশিয়রা বাস করে। এরা দীর্ঘদেহী হয়ে থাকে।

৭) **মাইক্রোনেশিয় ঃ** প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপমালায় মাইক্রোনেশিয়রা বাস করে।

www.pathagar.com

৮) **ভারতীয় ঃ** দক্ষিণ এশিয়ার হিমালয় পর্বতমালা থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় যে সব মানুষ বাস করে তাদেরকে ভারতীয় বলে অভিহিত করা হয়েছে। রক্তের গ্রুপের দিক দিয়ে অনেক পার্থক্য সত্বেও ইউরোপিয়দের সাথে এদের মিল হলো 'বি' গ্রুপের রক্তের আধিক্য।

৯) **ইউরোপিয় ঃ** আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির উত্তর ভাগ, মধ্যপ্রাচ্য এবং গোটা ইউরোপের লোকেরা এই রেস বা প্রজাতির অন্তর্ভূক্ত। নিউজিল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিন আমেরিকা ও দক্ষিন আফ্রিকার সাদা চামড়ার মানুষেরা এই প্রজাতিভূক্ত। সাধারণভাবে এদের গায়ের চামড়ার রং হালকা হলেও দক্ষিন ভাগে গাঢ় চামড়ার মানুষও দেখা যায়।

উপরে বর্নিত এসব প্রজাতির মানুষ স্থানীয় নানা প্রজাতিতে বিভক্ত হতে পারে এবং স্থানীয় প্রজাতিরও ক্ষুদ্রতর প্রজাতিগত বিভক্তি থাকতে পারে। এসব ক্ষুদ্র রেস আবার মাইক্রো রেস-এ বিভক্ত। এসব ক্ষুদ্র-বৃহৎ গোষ্ঠীকে নৃ-বিজ্ঞানীগন অতীতে তিনটি মহাজাতিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছিলেন। এগুলো হলো ঃ

১) ইউরোপয়েড মহাজাতি
২) নিগ্রোয়েভ - অষ্ট্রালয়েড মহাজাতি
৩) মঙ্গোলয়েড মহাজাতি

আর এ তিনটি মহাজাতিকে সংকুচিত করা হলে একটি মাত্র জাতি পাওয়া যাবে, আর তা হলো অখন্ড মানুষ জাতি। আধুনিক জ্বিন তত্ত্ব আমাদের সামনে মানব জাতির এক কেন্দ্রিকতা অর্থাৎ একই উৎস হতে উৎপত্তি হওয়ার তত্ত্ব ও সত্যকে নির্দেশ করছে। মানব জাতির মহাজাগতিক ও ভৌগলিক বিভাজন থেকেও আমরা মানুষের গায়ের রং, দৈহিক গঠন, মাথা ও মগজ এবং রক্তের গ্রুপ থেকে তাদের সম্পর্কে যে সব তথ্য জানতে পেরেছি এ সবই জাতি গুলোর মধ্যে সামান্য পার্থক্য নির্দেশ করছে এবং উৎসের অভিন্নতার প্রতি ইংগিত করছে। মহাগ্রন্থ আল কোরআন আমাদেরকে সেই সত্যের প্রতিই দিক নির্দেশনা প্রদান করছে।

কোরআনের আলোকে জাতি সমূহের সৃষ্টি ঃ আল্লাহ তায়ালার কালাম মহাগ্রন্থ আল কোরআন মানুষের উৎপত্তি ও অভিন্ন জাতি গোষ্ঠিতে বিভক্ত হওয়া সম্পর্কে যে তত্ত্ব প্রদান করেছে কোরআনের ভাষায় তা হলো ঃ

"হে মানুষ, তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করো- যিনি তোমাদের একটি মাত্র মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতপর তিনি তা থেকেই (তার) জোড়া সৃষ্টি

www.pathagar.com

করেছেন। এর পর তিনি তাদের (এই প্রাথমিক জুড়ি) থেকে বহু সংখ্যক নরনারী (দুনিয়ার চারদিকে) ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (আন নেসা ঃ ১)

"হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর আমি তোমাদের জন্য জাতি ও গোত্র বানিয়েছি, যাতে করে এর মাধ্যমে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো।" (হুজুরাত ঃ ১৩)

"এক সময় দুনিয়ার সব মানুষ ছিল একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি।" (বাকারা ঃ ২১৩)

মহাগ্রন্থ আলকোরআনের উপরোক্ত আয়াত সমূহ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, শুরুতে মানব জাতি একটি একক ও ঐক্যবদ্ধ জাতি ছিল। আজকের মত এত জাতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল না। তারপর ক্রমান্বয়ে তাদের বিস্তৃতি ও বিকাশ ঘটে এবং সংখ্যা বেড়ে যায়। ফলে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া এসব মানুষের পারস্পরিক চেনা জানার জন্য বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠি বিভিন্নভাবে তাদের নামকরণ করে। এ সবই মহান আল্লাহর সূক্ষ্ম পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাস্তবায়িত হয়েছে। কোন দূর্ঘটনা বা বিবর্তনের ফলশ্রুতিতে ঘটে নাই। অথবা দুনিয়ার সকল গরিলা, শিম্পাঞ্জী, গিবন বা ওরাংওটাং জাতীয় বানর হঠাৎ করে এক দিন তাদের আকার আকৃতি পরিবর্তন সাধন করে আধুনিক মানুষের রুপ লাভ করে মিছিল করে দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েনি। কোরআনের উপরোক্ত বাণীর আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় দুনিয়ার সকল মানুষ আদি পিতা আদম (আঃ) ও মা হাওয়া (আঃ) এর সন্তান- সন্ততির বিকশিত রুপ ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

www.pathagar.com

সভ্যতার বিকাশ ও আলকোরআন

আমরা ইতোপূর্বেকার আলোচনা থেকে জানতে পারলাম যে, পৃথিবীতে মানুষের উৎপত্তি কোন প্রকার বিবর্তন কিংবা দূর্ঘটনার ফসল নয়। মানুষ মহান আল্লাহর পরিকল্পিত সৃষ্টি এবং তারা পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি মানুষ ও তাদের সমন্বয়ে সৃষ্ট হাজারো ক্ষুদ্র-বৃহৎ জাতি-গোষ্ঠি আদি মানব আদম (আঃ) ও মা হাওয়ার বংশধর। সৃষ্টির শুরুতে তারা একটি একক জাতি ছিল। তাদের আদর্শ-উদ্দেশ্য, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, কৃষ্টি-সভ্যতা ছিল এক ও অভিন্ন।

কিন্তু দিনে দিনে তাদের বংশ বিস্তার ঘটেছে। জীবন ধারণ, দ্বন্দ-সংঘাত, আধিপত্য বিস্তার ও যুদ্ধ বিগ্রহ, প্রাকৃতিক দূর্যোগ হতে আত্মরক্ষা, নতুনত্বের সন্ধান ইত্যাদি নানা কারণে মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাড়ি জমায় এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। আর এ ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। উদাহরণত, বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ও সর্বাধিক ক্ষমতাশালী দেশ যুক্তরাষ্ট্র যেটি অভিবাসীদের (emigrants) দেশ হিসেবে পরিচিত। আর এভাবে শুধুমাত্র জাতি-গোষ্ঠীই নয় সভ্যতারও সৃষ্টি হয়েছে এবং বিস্তার লাভ করেছে।

প্রাচীন সভ্যতা ঃ ইতিহাস অধ্যয়নে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিদ্যমান যে সব সভ্যতার সন্ধান পাই সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ন হলো ঃ

১) মিসরীয় সভ্যতা ২) সুমেরীয় সভ্যতা ৩) ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ৪) এ্যাসিরীয় সভ্যতা ৫) ক্যালডীয় সভ্যতা ৬) পারস্য সভ্যতা ৭) হিব্রু সভ্যতা ৮) প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ৯) চীন সভ্যতা ১০) গ্রীক সভ্যতা ১১) রোমান সভ্যতা ও ১২) প্রাচীন আমেরিকার সভ্যতা।

এই সভ্যতাগুলো প্রাচীন বা ঐতিহাসিক কালের সভ্যতা নামে পরিচিত। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় এসব সভ্যতার বয়স সর্বাধিক ৭০০০ বছর থেকে ২৫০০ বছর। মানব সমাজের ইতিহাসকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলোঃ (ক) পাথরের যুগ ও (খ) ধাতুর যুগ। পাথরের যুগ হলো লিখন পূর্ব মানব সমাজের ঐতিহাসিক যুগ। আর ধাতুর যুগ হলো মানব সমাজের লিখিত উপাত্তের মাধ্যমে রচিত ইতিহাসের যুগ। লিখন পূর্ব আদিম সমাজের ইতিহাসের বিস্তৃতি অনেক বড় মনে করা হয়। যার সমাপ্তিকাল ধরা হয় ৫০০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ। উপরে উল্লেখিত সভ্যতাগুলো হলো ধাতু যুগের সভ্যতা।

www.pathagar.com

ক) পাথরের যুগ ঃ পাথরের যুগকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো ঃ পুরোপলীয় যুগ বা প্রত্ন প্রস্তর যুগ এবং নবোপলীয় যুগ। ণৃবিজ্ঞানীগন এই যুগগুলোকে মূলত মানুষের তৈরী ও ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতির আকৃতির গুণগত মানের উপর ভিত্তি করে নামকরণ করেছেন।

পুরোপলীয় যুগের বৈশিষ্ট্য হলো মানুষ তার জীবন ধারনের জন্য পশুপালন ও কৃষি কাজ করতো। আত্মরক্ষার জন্য পাথরের তৈরী অস্ত্র ব্যবহার করতো, পশুপালন করতো, স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ঘরবাড়ী নির্মাণ করতো, পর্যায়ক্রমে সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলে, পোশাকের ব্যবহার জানতো, আগুনের ব্যবহার করতো, ভাষা ও লেখার ব্যবহার জানতো, মৃত মানুষকে কবর দিতো, চিত্রকলার ব্যবহার জানতো। সর্বোপরি তাদের সমাজ বিন্যাস ও জীবন চর্চার সঙ্গে ধর্ম অংগাঅংগিভাবে জড়িত ছিল।

পুরোপলীয় যুগের শেষে শুরু হয় নবোপলীয় যুগ। এ যুগে কৃষির পাশাপাশি পশুপাখি পালন বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থায়ী আশ্রয়স্থল নির্মাণ ও হাতিয়ারের উৎকর্ষতা সাধিত হয়। এ সময় চাকার আবিষ্কারের ফলে সভ্যতার আরেক ধাপ অগ্রগতি সাধিত হয়। মানুষ কাপড় বোনা শিক্ষা করে, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য অলংকার তৈরী শিক্ষা লাভ করে এবং আগুন জ্বালানোর পদ্ধতি শিক্ষা করে। এ যুগে মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে ক্ল্যান ও ট্রাইব গঠন করেছিল। শিল্পকলা ও ধর্মের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়। ভাষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এ যুগে ব্যাপকহারে জন অভিবাসন (migration) ঘটেছিল। ফলে পৃথিবীর দিকে দিকে সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে।

খ) ধাতুর যুগ ঃ নবোপলীয় যুগ থেকে নগর সভ্যতার উন্মেষের মধ্যবর্তী যুগকে তাম্র যুগ বলা হয়। মানব সভ্যতা বিকাশের ধারায় এ যুগের অবদান অনেক। ধাতু যুগের পর পর্যায়ক্রমে ব্রোঞ্জ যুগ ও লৌহ যুগের আবির্ভাব ঘটে। এ যুগের সবচেয়ে যুগান্তকারী ঘটনা হলো **'নগর বিপ্লব'**। এ বিপ্লবের ফলে মানুষের চিন্তা-ধারা, সমাজ-সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা, শাসন-আইন, প্রতিরক্ষা, জীবনযাপন প্রনালীসহ জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়।

প্রাচীন সভ্যতা সমূহের বিকাশ স্থান ঃ সভ্যতার বিকাশ সম্পর্কে যে ১২টি প্রাচীন সভ্যতার উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর অধিকাংশই মধ্যপ্রাচ্য কেন্দ্রিক। আর এ সভ্যতাগুলিই প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে প্রাচীনতম। হিব্রু সভ্যতা মূলত ইহুদী সভ্যতা; তাও মধ্যপ্রাচ্য কেন্দ্রিক সভ্যতা। পারস্য সভ্যতা, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, গ্রীস ও রোমান সভ্যতা মধ্যপ্রাচ্যের নিকটতম সভ্যতা। চীনা সভ্যতার সংগে মধ্যপ্রাচ্যের জল ও স্থল পথের যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকায় এ সভ্যতাকেও দূরের কোন সভ্যতা বলা যাবে না। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেবল মাত্র প্রাচীন

www.pathagar.com

আমেরিকার সভ্যতা। আর আমেরিকার সভ্যতা অতি প্রাচীন কোন সভ্যতা নয়। আমেরিকার সভ্যতার কথা বাদ দিলে রোমান সভ্যতাকে সবচেয়ে প্রাচীন বলা যায়-যা গ্রীক সভ্যতার সংস্পর্শে গড়ে উঠে। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে রোম নগরীর প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এ সাম্রাজ্যের যাত্রা শুরু হয় এবং ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে পতন ঘটে।

ইতিহাস পাঠে আমরা দেখতে পাই যে, এ সব প্রাচীন সভ্যতা বিভিন্ন নদ-নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। উদাহরণত, নীল নদকে কেন্দ্র করে মিশরীয় সভ্যতা, পারস্য উপসাগরকে কেন্দ্র করে পারস্য সভ্যতা, হোয়াংহো নদীর তীরে চীন সভ্যতা এবং সাগর ও পর্বতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে রোমান সভ্যতা। মরূভূমির বালুচরে খুব কাছাকাছি জায়গায় গড়ে উঠে সুমেরীয় সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, এশীয় ও ক্যালডীয় সভ্যতা। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা গড়ে উঠে হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা ইত্যাদি নদ-নদী বিধৌত সমতল ভূমিতে। আর গ্রীক সভ্যতা গড়ে উঠে সম্পূর্ন পাহাড়-পর্বত বেষ্টিত পার্বত্য এলাকায়।

প্রাচীন সভ্যতা সমূহের সমাজ চিত্র ঃ এসব সভ্যতার সমাজ চিত্র কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় একই রকম ছিল। তাই এসব সভ্যতার সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারনা পাওয়ার লক্ষ্যে কয়েকটি সভ্যতার সংক্ষিপ্ত সমাজ চিত্র তুলে ধরা হলো। উদাহরণত, মিশরীয় সমাজের মানুষ মূলত দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এগুলি হলো ঃ (১) মুক্ত বা স্বাধীন মানুষ এবং (২) ভূমিদাস। স্বাধীন মানুষদের মধ্যেও কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ ছিল। এগুলি হলো ঃ (ক) রাজ পরিবার, (খ) পুরোহিত (গ) অভিজাত (ঘ) ব্যবসায়ী (ঙ) লিপিকর (চ) শিল্পী এবং (ছ) কৃষক। সাম্রাজ্যের যুগে আরও দুটি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। একটি স্বাধীন, আর অন্যটি পরাধীন। এ দুটো গ্রুপকে অন্য ভাষায় সামরিক ব্যক্তি ও দাস নামে অভিহিত করা যায়। সাম্রাজ্যের যুগে সামরিক বাহিনীর ছিল দোর্দন্ড প্রতাপ। এঁ সময় যাদুবিদ্যা ও কুসংস্কারের উপর বিশ্বাস বৃদ্ধির কারণে সমাজে পুরোহিতদেরও ক্ষমতা বেড়ে যায়।

এ সমাজে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান বিরাজ করতো। রাজপরিবার, ভূ-স্বামী, পুরোহিতরা বাস করতো প্রাসাদোপম দালানকোঠায়। আরামআয়েশের সকল উপকরন তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল। এ সমাজে দাসদের অবস্থান ছিল সবার নিচে। সবার জন্য একটি মাত্র বিয়ের ব্যবস্থা থাকলেও অনেকের হারেম থাকতো অবৈধ নারীতে ভরপুর। আমরা মিশরের পিরামিডগুলির দিকে তাকালে এ সত্যের প্রমান পাবো।

পুরোহিতদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে আমরা ধারনা করতে পারি যে, প্রাচীন মিশরীয় সমাজে ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ন অবস্থান ছিল। সাম্রাজ্যের

www.pathagar.com

যুগে ফারাওগন দেবতার নামেই রাজ্য শাসন করতো। প্রথম অবস্থায় তারা বিভিন্ন পশু পাখির পূজা করতো। বিভিন্ন নগরীর উত্থানের সাথে সাথে আঞ্চলিক দেব-দেবীর বিকাশ ঘটে।

এ সকল দেব-দেবী প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক। তবে মিশরীয় সভ্যতার সকল স্তরে ধর্ম বিশ্বাস একরকম থাকেনি। সময়ের পরিবর্তনে তাদের ধর্ম বিশ্বাসেও পরিবর্তন আসে। ফলে মিশরীয় ধর্ম বহু দেবতাবাদ থেকে একেশ্বরবাদে রুপান্তরিত হয়েছিল। বর্তমানে মিশরীয়রা প্রায় সবাই মুসলমান। কোরআন বর্ণিত ইহুদী জাতি, ফেরাউন ও নবী মুসার (আঃ) কাহিনীর সংগে প্রাচীন মিসরীয় সমাজের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

মিসরীয় সমাজের সাথে প্রায় হুবহু মিলে যায় সুমেরীয় সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, এ্যাসিরীয় সমাজ ও ক্যালডীয় সভ্যতা। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা এবং পরবর্তী গ্রীক সভ্যতায় সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে একই অবস্থা আমরা প্রত্যক্ষ করি। এ ক্ষেত্রে আমরা পারস্য সভ্যতায় ভিন্নতা লক্ষ্য করি। প্রাচীন পার্সীগন ছিল প্রকৃতি পূজারী। তারা সূর্য, চন্দ্র, বৃষ্টি, বাতাস, আকাশ, মাটি ও আগুনের পূজা করতো। পূজার অনুষ্ঠানে তারা প্রাকৃতিক শক্তির উদ্দেশ্যে শস্য, দুধ, ফুল ইত্যাদি উৎসর্গ করতো। এ ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় ও বর্তমান হিন্দুদের সংগে প্রাচীন পারসীয়দের ধর্মের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে চীনের সমাজ ছিল অভিজাত কেন্দ্রিক। ভূস্বামী ও কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান ছিল। এ সময় চীনে বৃহদায়তন পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। নারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়, যা আজও বহাল আছে। তাদের ধর্ম পরিপূর্ন ছিল স্বর্গীয় প্রভাব, প্রেতাত্মা ও দেব-দেবীর বিশ্বাস দ্বারা। তারা নদী দেবতা, পাহাড় দেবতা, বৃষ্টি দেবতা, গৃহ দেবতা সহ নানা প্রকার দেবতায় বিশ্বাস করতো। পরবর্তীতে দার্শনিক কনফুসিয়াস তাদের ধর্ম ও বিশ্বাসে পরিবর্তন আনয়ন করেন।

রোমানরা ছিল মূলত অর্থোডক্স খৃষ্টান। তারা খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে রাজতন্ত্র উৎখাত করে প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করে। পরবর্তীতে সীজার একনায়কতন্ত্র কায়েম করেন।

উপরোক্ত সভ্যতা সমূহের আলোচনা থেকে দেখা যায় সকল সভ্যতায় দেশের মানুষগুলো প্রধান দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এগুলো হল শাসক ও শাসিত অর্থাৎ অভিজাত শ্রেণী ও সাধারন জনতা। অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল (১) রাজা ও রাজপরিবার এবং তাদের সংগে সংশ্লিষ্ট সামরিক ও বেসামরিক আমলা শ্রেণী, (২) পুরোহিত বা ধর্মীয় শ্রেণী এবং (৩) ধনীক শ্রেণী, যারা ছিল সামন্ত প্রভু বা জমির মালিক। আর সাধারন জনতার মধ্যে ছিল কৃষক, শ্রমিক ও

www.pathagar.com

দাস শ্রেণী। অভিজাত শ্রেণীর ভোগ বিলাসের জোগান দেয়াই ছিল তাদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। তারা ছিল শোষিত আর অন্যরা ছিল শোষক।

আমরা জাতি সমূহের উৎপত্তি ও সভ্যতার বিকাশ সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক যে ধারনা লাভ করেছি তা মানুষের জ্ঞান গবেষনা ও অনুমান নির্ভর তত্ত্ব ও তথ্য থেকে গৃহিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মানুষকে কতিপয় বানর প্রজাতির বংশধর হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং আজকের আধুনিক মানুষকে বিবর্তনের চরম উৎকর্ষতার ফলাফল হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বানর যেহেতু এক ধরনের পশু, তাই মানব সভ্যতার বিকাশের ধারা বর্ণনায় মানুষের বস্তুতান্ত্রিক চাওয়া-পাওয়া এবং অগ্রগতি ও উৎকর্ষতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। মানুষের বস্তুগত শিক্ষা-প্রযুক্তি, সাহিত্য-সংস্কৃতি , জীবন ধারন ও রাষ্ট্র শাসনের ক্ষেত্রে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিককে কোন প্রকার গুরুত্ব দেয়া হয়নি। যদিও সকল সভ্যতাতেই ধর্মের স্থান রয়েছে। কিন্তু সে ধর্ম হলো প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিভিন্ন বস্তু ও সৃষ্টির পূজা-উপসনা কিংবা শাসক শ্রেণী ও পুরোহিতদের প্রভুত্বের আসনে স্থান দেয়া, তাদের দাসত্ব ও আনুগত্য করা।

কোরআনের দৃষ্টিভংগী ঃ জাতি সৃষ্টির ন্যায় সভ্যতার বিকাশ প্রসংগেও মহাগ্রন্থ আলকোরআনের ইতোপূর্বে উল্লেখিত সূরা আন নিসার ১নং আয়াত, সূরা আল হুজুরাতের ১৩ নং আয়াত এবং সূরা আল বাকারার ২১৩ নং আয়াত সমভাবে প্রযোজ্য। আমরা পাঠকদের বুঝার সুবিধার্থে আয়াতগুলি পূনরায় উল্লেখ করছি। আয়াতগুলো হলো ঃ

" হে মানুষ, তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করো- যিনি তোমাদের একটি মাত্র মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতপর তিনি তা থেকেই (তার) জোড়া সৃষ্টি করেছেন-এর পর তিনি তাদের থেকে বহু সংখ্যক নরনারী দুনিয়ার চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (আন নেসা ঃ ১)

"হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর আমি তোমাদের জন্য জাতি ও গোত্র বানিয়েছি, যাতে করে এর মাধ্যমে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো।" (আল হুজুরাত ঃ ১৩)

"এক সময় দুনিয়ার সব মানুষ ছিল একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি। তারপর তারা যখন পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়ে মূল স্রষ্টাকে ভুলে গেল তখন আল্লাহ তায়ালা নবী পাঠালেন (জান্নাতের) সুসংবাদ দাতা ও (জাহান্নামের কঠিন শাস্তি সম্পর্কে) সতর্ককারী হিসেবে। আল্লাহ শুধু নবীই পাঠাননি, তিনি তাদের সাথে সত্য গ্রন্থও নাযিল করলেন যেন এই পুস্তক মানুষদের পারস্পরিক বিরোধ সমূহের চূড়ান্ত ফয়সালা করতে পারে। প্রথমতঃ আল্লাহর নাযিল করা কিতাব নিয়ে বেশী লোক মতভেদ করেনি। (তবে হাঁ,) কিছু লোক উজ্জ্বল নিদর্শন ও

www.pathagar.com

সুস্পষ্ট হেদায়াত পাঠানো সত্বেও এ ব্যাপারে মতবিরোধের সৃষ্টি করে। এরা পরস্পর বিদ্রোহেরও সিদ্ধান্ত করে। অতপর যারা ঈমান গ্রহন করলো আল্লাহ তাদের সবাইকে স্বীয় ইচ্ছায় সেই সঠিক ও সহজ পথ দেখালেন, যার ব্যাপারে ইতোপূর্বে তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। (সত্যিকার কথা হচ্ছে) আল্লাহতায়ালা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন তাকেই তিনি সঠিক পথ দেখান।"

কোরআনের উপরোক্ত আয়াতগুলি হতে দেখা যায়, মানুষ আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুসারেই দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্বাভাবিক পরিনতি হিসেবে জাতি ও সভ্যতার অভ্যূদয় ঘটে। এভাবে মানুষের জীবন জীবিকার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জিত হয় এবং তাদের মধ্যে নানা প্রকার সুপ্ত যোগ্যতা ও প্রতিভার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে। এ সবই আল্লাহর দয়া ও মহানুভবতার ফলশ্রুতি।

মানুষের মাঝে লুকিয়ে থাকা রকমারি যোগ্যতা, ক্ষমতা ও প্রতিভার বিকাশের কারণে তাদের আদর্শ ও দৃষ্টিভংগি, জীবন যাপনের পন্থা ও পদ্ধতি এবং আকীদা বিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন রুপ ধারন করে। আর এ কারণেই মহান আল্লাহ সাবধানকারী ও সুসংবাদদাতা হিসেবে নবী ও রাসুলদের প্রেরন করেন।

আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিত্বের জন্য সৃষ্টি করেন। তিনি জানতেন এ গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য যোগ্যতা ও প্রতিভার বিভিন্নতা একান্ত জরুরি। আর বহুবিধ চাহিদা ও প্রয়োজন পূরনের জন্য নানামুখী ক্ষমতাও আবশ্যক। তাই অতি স্বাভাবিক ভাবে যোগ্যতা ও দায়িত্বের বিভিন্নতার কারণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মতবাদ, মতাদর্শ, ধ্যান-ধারনা ও জীবন যাপন প্রনালীতেও বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়। তবে এসব প্রত্যাশিত ও বাস্তব মতভেদ সুস্থ ও ন্যায়সংগত হোক এবং তা একটা প্রশস্ত ও সুপরিসর গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকুক এটাই আল্লাহ তায়ালার পছন্দ। এই প্রশস্ত গন্ডিটি হলো বিশুদ্ধ ঈমানের গন্ডি। ঈমানের এই গন্ডিটি ধারন করেছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত কিতাব এবং সেগুলোর বাহক ছিল তাঁর নবীগন। আর এভাবেই মানব জাতির পৃথিবীতে আগমনের দিন থেকেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির দু'টি সমান্তরাল ধারা পৃথিবীতে বিরাজমান ছিল। একটি খোদা প্রদত্ত আর অন্যটি শয়তান প্রদর্শিত। একটি ইসলাম আর অন্যটি জাহেলিয়াত। একটির নেতৃত্বে ছিল আল্লাহর নবীগন, আর অন্যটির নেতৃত্বে ছিল খোদাদ্রোহী তাগুত ও কায়েমী স্বার্থবাদ। কোরআনের পাতায় সভ্যতার উত্থান-পতন শীর্ষক আলোচনায় আমরা এই দুই বিপরীত শক্তির দ্বন্দ সংঘাতের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই।

www.pathagar.com

সভ্যতার মধ্য যুগ ঃ

সভ্যতার উত্থান-পতনের ধারায় নৃতাত্ত্বিক, সমাজ বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকগন ইতিহাসের একটি অধ্যায়কে **'সভ্যতার মধ্য যুগ'** নামে আখ্যায়িত করেছেন। এ সব ব্যক্তিবর্গ ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সভ্যতার পতনকে এ সভ্যতার সূচনা পর্ব , আর ১৪৯২ সালে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের ঘটনাকে এ যুগের অবসান কাল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যুগ বিভাজনের ক্ষেত্রে কেউ কেউ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ অথবা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পর্বেই আধুনিক সভ্যতার লক্ষণ দেখতে পেয়েছেন। তবে সাধারনভাবে মনে করা হয় রেঁনেসা বা নুতন সভ্যতা শুরুর পূর্ব পর্যন্ত কোন না কোনভাবে মধ্যযুগের চরিত্র বজায় ছিল। এ কারণে যুগ নয় চরিত্র বিচারে সভ্যতার বিভাজন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন। কেননা ইউরোপে যখন মধ্যযুগ বিরাজ করছিল তখনও ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীন যুগের পূর্নাংগ অবসান ঘটেনি।

আবার ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যখন মধ্যযুগ, তখন ইউরোপ প্রস্তুতি নিচ্ছিল আধুনিক যুগে উত্তরণের। অতএব এ ক্ষেত্রে কাল নয়, চরিত্র বা ধরণই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষনায় সভ্যতার যুগ নির্ধারনে চরিত্রের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকটিই মূলত প্রাধান্য লাভ করেছে। এ ক্ষেত্রে মানুষের ধর্ম ও নৈতিকতা উপেক্ষিত হয়েছে। মানুষের বানরের প্রজাতি এবং সে হিসাবে তাদের বস্তুগত উন্নয়ন ও বিকাশকেই সভ্যতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অথচ আমরা জানি মানুষের দেহের পাশাপাশি একটি আত্মাও রয়েছে। তার মাঝে পাপ-পূণ্য, নৈতিকতা-অনৈতিকতার বোধও বিদ্যমান। আর এ বোধ ও অনুভূতি থেকেই মানুষ মানবিক অথবা পশুসুলভ আচরণ করে। মানুষের এহেন আচরনের উপর ভিত্তি করেই আমরা একজন মানুষকে সভ্য বা অসভ্য, সুশীল বা কুশীল আখ্যা দিয়ে থাকি। পৃথিবীর যাবতীয় সুখ সম্ভোগের মাঝে থেকেও একজন ব্যক্তি, একটি সম্প্রদায়, একটি জাতি অসভ্য ও বর্বর হতে পারে। আবার দরিদ্র ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতিও এসব মানবিক গুনাবলীর কারণে সভ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। আর এ কারণে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবেচনায় সভ্যতার যুগ বিভাজন বিধি সম্মত নয়, আবার গ্রহনযোগ্যও নয়।

সভ্যতার ইতিহাস লেখকগন আধুনিক যুগে বাস করে বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস রচনা করেছেন। আধুনিক সভ্যতা বলতে ইউরোপীয় সভ্যতারই সম্প্রসারিত ও প্রভাবিত সভ্যতা মনে করা হয়। অতএব ইতিহাস লেখকগন প্রায় সকলেই ইউরোপীয়। তারা সভ্যতার মধ্যযুগকে **'অন্ধকার যুগ'** (Dark Ages) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ সব ঐতিহাসিক যখন ইতিহাস রচনা করেছেন

www.pathagar.com

তখন তারা ইউরোপের সমাজ ও ধর্মকে বিবেচনায় রেখেছেন, আর অন্য সমাজকেও ইউরোপের আয়নায় প্রত্যক্ষ করেছেন। এ ছাড়া সভ্যতার ব্যাখ্যায় তারা অন্য একখানা আয়নাও ব্যবহার করেছেন, আর তা হলো বস্তুবাদের আয়না। তাই তাদের আয়নায় রোমান সাম্রাজ্যের পতনকাল থেকে সমগ্র দুনিয়ার সকল সভ্যতাই অজ্ঞতা আর অন্ধকারে ডুবে ছিল। তাদের চোখে ইসলামী সভ্যতার উত্থানতো ধরা পড়েই নাই, এমনকি ঘরের পাশের বাইজেনটাইন সভ্যতা কিংবা চীন সভ্যতা তাদের বিবেচনায় আসতে পারেনি।

সভ্যতার ইতিহাস লেখক ও পাঠকদের জানা থাকা দরকার যে, ইউরোপ মানেই পৃথিবী নয়। এটি পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আরও মনে রাখা দরকার যে, প্রাচীন সভ্যতা ও মধ্যযুগের সভ্যতার উত্থানের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে এশিয়া এবং এশিয়ার মধ্যপ্রাচ্য এলাকা। আজকের আধুনিক সভ্যতা তাদের সভ্যতার উত্তরসূরী, তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র পরিচালনার কৌশল এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সবই তাদের কাছ থেকে পাওয়া।

এ ক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য কথা হলো, আধুনিক সভ্যতার পথ প্রদর্শক হলো ইসলামী সভ্যতা। আর এ সভ্যতার সূচনা হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের মক্কা মদীনায় হজরত মুহম্মদ (সাঃ) এর নেতৃত্ব ও পরিচালনায়। যেখানে মধ্যযুগের সূচনা ধরা হয়েছে রোমান সভ্যতার পতনকাল ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে, সেখানে ইসলামের শুভ সূচনা ঘটে ৬১১ খ্রিষ্টাব্দে। পক্ষান্তরে মধ্যযুগের সমাপ্তি ধরা হয়েছে ১৪৯২ সাল, অথচ তখন এশিয়া, আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ এবং ইউরোপের কিছু এলাকা জুড়ে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃতি ঘটে সেসব এলাকায় একত্ববাদ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির বিজয় কেতন উড়াচ্ছিল। এ সভ্যতার ছোঁয়া লেগেছিল গোটা মধ্যএশিয়া এবং চীন ও ভিয়েতনামসহ সমগ্র দক্ষিন এশিয়ায়। এ সময় ইসলাম যে সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল তার সমমানের সভ্যতা পৃথিবী তার আগে কখনও প্রত্যক্ষ করেনি এবং আজকের আধুনিক সভ্যতাও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বাদ দিলে কোনভাবে তার সমকক্ষ নয়। তাহলে এ যুগকে কিভাবে **'অন্ধকার যুগ'** হিসেবে আখ্যায়িত করা হলো। এ ক্ষেত্রে যা বলা যায় তাহলো, অজ্ঞতা কিংবা ঈর্ষা।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবেচনায় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ পর্বে ইউরোপে প্রাচীন সভ্যতার অবসান ঘটে। মূলত এ সময় প্রাচীন রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এক ধরনের ভাঙন দেখা দেয়। দাসশ্রম নির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ষষ্ঠ শতাব্দীর ইউরোপীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে আর নিয়ন্ত্রন করতে পারছিল না। ফলে পরিবর্তিত অবস্থায় নুতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সামন্ত প্রথার উদ্ভব ঘটে। এরই সঙ্গে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আসে পরিবর্তন, আর এভাবেই মধ্যযুগের লক্ষণ ফুটে

www.pathagar.com

উঠে। যুগ বিবেচনায় ইউরোপের অনুসঙ্গী হয় ভারতীয় উপমহাদেশ। গুপ্ত শাসন ব্যবস্থার ভাঙনের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের প্রকাশ পেতে থাকে ভারতবর্ষে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে অন্ধকার যুগ বা মধ্যযুগের অবসান ঘটে।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের বর্ননা মতে ইসলামের আবির্ভাব ও বিকাশপূর্ব পৃথিবী সত্যি অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। এ অন্ধকার ছিল জ্ঞানের অন্ধকার, আকীদা বিশ্বাসের অন্ধকার, ইবাদাত-উপাসনা ও ধর্মীয় অন্ধকার, সামাজিক ও রাজনৈতিক অন্ধকার, অর্থনৈতিক শোষন ও বৈষম্যজনিত অন্ধকার, শিল্প-সংস্কৃতিগত অন্ধকার এবং আরও বহু প্রকার অন্ধকারে গোটা বিশ্ব নিমজ্জিত ছিল। বিশেষভাবে তদানিন্তন আরব ভূমিকে **'আইয়্যামে জাহেলিয়াত'** হিসেবে অভিহিত করা হয়। ইসলামের উদ্ভব ও বিকাশের ফলে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো হতে অন্ধকার কেটে গিয়ে নতুন সভ্যতার বিকাশ ঘটে। কিন্তু ইউরোপ থেকে যায় সকল বিবেচনায় অন্ধকারে। খ্রিষ্টান চার্চ ও সামন্ত প্রভুদের মধ্যকার লড়াইয়ে তারা আরও পিছিয়ে পড়ে। পোপ পাদ্রীরা নানাভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। রাজা ও পাদ্রীগন একত্রিত হয়ে জনগনের উপর নিপীড়ন চালায়। ধর্মের সংস্কারের নামে বৈরাগ্যবাদের উগ্রতা তীব্রতর হয়। নুতন চিন্তা ও ধ্যান-ধারনাকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করতে থাকে এবং এ সব চিন্তার ধারক বাহকদের উপর গীর্জার পক্ষ থেকে জুলুম নিপীড়ন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। নারী নির্যাতন চরম আকার ধারন করে। এক পর্যায়ে চার্চ ও রাষ্ট্রের দ্বন্দ তীব্রতর হলে চার্চের উপর রাষ্ট্র বিজয়ী হয়।

অন্যদিকে আধ্যাতিকতা ও জাগতিকতার সমন্বয়ে গড়ে উঠা ইসলামী সভ্যতা এশিয়া ও আফ্রিকার সীমানা পেরিয়ে ইউরোপে প্রবেশ করলে পাদ্রীগন তাদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে সামন্তপ্রভূ এবং রাজা বাদশাহদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে দেশ ও ধর্ম রক্ষার যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য। মুসলমান এবং খ্রিষ্টানদের এ যুদ্ধকে তারা ক্রুসেড হিসেবে আখ্যায়িত করে। **'ক্রুসেডে'** মুসলমানদের জয়ের পাল্লা ভারী থাকে। ফলে ইউরোপে ধর্ম বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পায়। চার্চ ও রাজার মধ্যে বিরোধ তীব্রতর হয়। ইউরোপীয়গন মুসলিম সভ্যতার সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটলে তারা নতুন সভ্যতার **'মোজেজা'** নানা প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা নিজেদের উপকৃত করতে থাকে। এভাবে মুসলিম সভ্যতার ছোঁয়ায় এবং তাদের সাথে লড়াইয়ের পথ ধরে ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীতেই আধুনিক সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এ পর্যায়ে ইউরোপ থেকে উৎসারিত রেনেসাঁ বা আধুনিক সভ্যতা ধর্ম ও স্রষ্টাকে তাদের প্রতিপক্ষ হিসাবে গ্রহন করে। আধুনিক সভ্যতার বিকাশের ধারায় ধর্ম সেখানে পরাজিত হয়।

www.pathagar.com

অতএব পৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকভাবে যে যুগকে **'অন্ধকার যুগ'** হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে তা আংশিক সত্য। আর এ অবস্থা ইউরোপের দেশগুলোর ক্ষেত্রে সর্বাধিক সত্য। অন্যান্য দেশ ও জাতির ক্ষেত্রে যুগের কোন অংশে তা সত্য হলেও অধিকাংশ সময়ের জন্য তা সর্বৈব মিথ্যা। কেননা গোটা যুগকে **'অন্ধকার যুগ'** হিসেবে মেনে নিলে বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিকতম ধর্ম ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতাকে অন্ধকারের সমার্থবোধক হিসেবে গ্রহন করতে হয়। কিন্তু ইসলামের নিকৃষ্টতম দুশমনও কখনও তা উল্লেখ করে নাই।

সভ্যতার আধুনিক যুগ ঃ রাজনৈতিকভাবে বহুধা বিভক্ত ইউরোপের সর্বত্র মধ্যযুগের গোড়া থেকেই খ্রিষ্ট ধর্মের বিস্তার ঘটতে থাকে। আরব দেশ থেকে ইসলাম ধর্মের বিজয়াভিযান ছড়িয়ে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত খ্রিষ্ট ধর্ম কোনরুপ বাধা প্রতিবন্ধকতার সন্মুখীন হয়নি। কিন্তু ইসলাম ধর্ম অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বিস্তৃত হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে এই ধর্ম প্রাচ্যের খ্রিষ্টান অধ্যুষিত অঞ্চল এবং ইউরোপের দিকে অগ্রসর হয়। ইসলামের এই বিজয়াভিযান দেখে খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা ভীত-শংকিত হয়ে পড়ে। তাই মুসলমানদের অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে খ্রিষ্টান পোপ পাদ্রীগন ইউরোপের রাজা, বাদশাহ, জায়গীরদার, সামন্তপ্রভু এবং জনগনকে ধর্ম যুদ্ধের জন্য আহবান জানালে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী ব্যাপী সমগ্র ইউরোপে সর্বগ্রাসী ধর্মযুদ্ধ **(ক্রুসেড)** শুরু হয়। এ যুদ্ধে ইউরোপীয় খ্রিষ্টান শক্তি পরাজিত হলেও পাশ্চাত্য সভ্যতায় এ যুদ্ধের সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

ক্রুসেডে অংশগ্রহনকারী রাজা-বাদশাহ ও সৈন্যরা ইউরোপের অংশ স্পেন ও আন্দালুসিয়া, ফিলিস্তিন, তুরস্ক সহ বিভিন্ন অত্যাধুনিক শহর-নগর, শিক্ষা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটে। গীর্জা ও পোপ-পাদ্রীগনের প্রভাবে পাশ্চাত্যবাসীর মন-মগজ ও চিন্তা-চেতনায় যে অন্ধত্ব ও কুসংস্কার দানা বেঁধেছিল তা অপসারিত হতে থাকলো। তারা ইসলাম গ্রহন করেনি এটা সত্য, কিন্তু ইসলামী সভ্যতার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় তাদের সমাজ-সভ্যতায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ফলে চতুর্দশ শতাব্দী হতে ষষ্টদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময় ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ হতে আধুনিক যুগের দিকে অগ্রসর হওয়ার অন্তরবর্তীকাল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

প্রকৃতি বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র, অংক শাস্ত্র, প্রকৌশল ইত্যাদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে থাকে। ছাপাখানার আবিষ্কার চিন্তার প্রসার ও জ্ঞান বিস্তারের গতিকে অধিকহারে গতি দান করে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এহেন জাগরন প্রচলিত ধ্যান-ধারনা সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনার সুযোগ সৃষ্টি করে। নতুন নতুন জ্ঞান ও তথ্য প্রবাহ সাধারনভাবে

www.pathagar.com

সমগ্র সমাজ সভ্যতাকে নাড়া দেয়। এছাড়া নতুন নতুন ভৌগলিক এলাকার সংগে পরিচিতি সে সব দেশে নিজেদের পণ্য রপ্তানী, নিজেদের শিল্পের জন্য কাঁচামাল আমদানী এবং তাদের দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি আমদানী করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এভাবে গোটা ইউরোপের শিল্প -ব্যবসা সচল হতে থাকলো। নতুন নতুন শহর-নগর স্থাপিত হলো। মানুষের জীবন যাত্রা উন্নত হলো। এই নুতন জাগরনের অগ্রদূত ছিল 'বুর্জোয়া' শ্রেণীর লোকেরা। আর তারাই ছিল এ জাগরনের প্রধান সুবিধাভোগী। কিন্তু গীর্জা ও সামন্ত প্রভুদের বাধা ও প্রতিরোধ তাদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে লাগলো। ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর সংগে চিন্তা-চেতনা, ধর্ম, নৈতিকতা, সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রে তাদের দ্বন্দ-সংঘাত সৃষ্টি হয়। আর এর ফল হলো গীর্জা ও সামন্ত প্রভুদের পশ্চাদপসরন এবং নতুন শক্তির উত্থান। ষষ্টদশ শতাব্দী শুরু না হতেই ক্ষুদ্রাকার জায়গীরগুলোর ধ্বংসস্তুপের উপর বড় বড় জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হলো। গোটা ইউরোপ জুড়ে খ্রিষ্টান বৈরাগ্যবাদের আধিপত্য ভেঙে পড়লো। গীর্জাগুলো চলে গেল ধর্মহীন শাসকদের নিয়ন্ত্রনে। এক বিশ্বব্যাপক ধর্ম-ব্যবস্থার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকলো জাতীয় গীর্জা সমূহ। এভাবে গীর্জা ও জায়গীরদারদের যৌথ কর্তৃত্ব ছিন্ন হওয়ার ফলে সামাজিক ঐতিহ্যগত বাধা-বন্ধন মুক্ত বুর্জোয়া কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হলো।

বুর্জোয়া শ্রেণী যে মতবাদের হাতিয়ার দিয়ে গীর্জা ও সামন্তবাদীদের সাথে লড়াই করেছে তা হলো উদারনৈতিকতাবাদ (Liberalism)। **নব্য সভ্যতার** পতাকাবাহীরা ধর্ম, দর্শণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজ, সভ্যতা; রাজনীতি ও অর্থনীতিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে উদার নীতি অনুসরন করছিল। এভাবে তারা প্রগতির পথে বাধা-প্রতিবন্ধক হতে পারে এমন সব কিছুর অপসারনে সচেষ্ট ছিল।

এই দ্বন্দ-সংগ্রামের দুই প্রতিপক্ষ গীর্জা ও সামন্তবাদীরা, এবং বুর্জোয়া শ্রেণী চরম সংকীর্নতার পরিচয় দিতে লাগলো। উভয় পক্ষই সততা ও ন্যায়-নীতি থেকে দুরে সরে যায়। এক পক্ষ নিজেদের কর্তৃত্ব ধরে রাখার জন্য ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছিল। আর অন্য পক্ষ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ধর্ম ও নৈতিকতার চিরন্তন আদর্শ পূর্নাংগভাবে ত্যাগ করলো। এ সময় রাজনীতি থেকে ধর্ম ও নৈতিকতাকে good bye জানানো হলো। **মেকিয়াভেলি** জোরগলায় প্রচার করতে লাগল যে, রাজনৈতিক স্বার্থ ও সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে নৈতিক নিয়মাবলী মেনে চলার কোন প্রয়োজন নেই। এ যুগেই তৈরী হয় জাতীয় রাষ্ট্রের মূর্তি তথা জাতীয়তাবাদ। এ রাষ্ট্রের ধারক ও বাহকগন আবহমানকাল হতে নিষিদ্ধকৃত 'সুদ' প্রথাকে তাদের অর্থব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ হিসেবে গ্রহন

www.pathagar.com

করে। এভাবে ব্যবসা বানিজ্য থেকেও নৈতিকতা বিদায় গ্রহন করলো। নতুন সভ্যতার উদ্যোক্তা বূর্জোয়া শ্রেণী প্রাচীন গীর্জা ও সামন্তবাদীদের স্থান দখল করলো নতুন নামে। ফলে জন্ম নিলো সম্পূর্ন এক বস্তুবাদী সভ্যতা।

রেনেসাঁর যুগে যে বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে তা শতগুন বেড়ে যায়। অভিনব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, তথ্য ও আবিষ্কার উদ্ভাবনীকে শিল্প, কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রয়োগ করা হলে পণ্যোৎপাদন, কাঁচামাল সংগ্রহ ও বিশ্বের কোণে কোণে উৎপন্ন পণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থা চিন্তার অভাবনীয় ধারায় কার্যকরী হতে লাগলো।

এই শিল্প বিপ্লবের সকল সুবিধা বূর্জোয়া শ্রেণীর পকেটস্থ হলো। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উপরও তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। তারা পুঁজি, কর্মদক্ষতা ও সাংগাঠনিক যোগ্যতা --- এই তিনটির সমন্বয়ে শিল্প ও বানিজ্যের এক নতুন ব্যবস্থা রচনা করলো, যার নাম **"আধুনিক পুঁজিবাদ"**। এই ব্যবস্থার অধীন শহর নগরে বড় বড় কলকারখানা ও ব্যবসায় স্থাপিত হলো। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও শিল্প মালিকরা মার খেতে লাগলো এবং গ্রাম গঞ্জের মানুষ শ্রমিক ও কর্মজীবি হিসেবে শহর-নগরে স্রোতের ন্যায় ছুটতে লাগলো। এক পর্যায়ে এসব বূর্জোয়াদের সংগে শ্রমিকদের দ্বন্দ সংঘাত শুরু হলো এবং ফলশ্রুতিতে অন্য একটি ধর্মহীন মতবাদের জন্ম হলো, আর তা হলো **'সমাজতন্ত্র'**। আর এভাবে পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদের মোকাবেলায় প্রাচ্যের রাশিয়া ও চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেলো। সারা বিশ্ব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই দ্বিমুখী শক্তির সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হলো। বিশ্ব পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধের মোকাবেলা করে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমানে সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে নুতন করে বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের লড়াই চলছে। আর তা চলছে নতুন বিশ্বব্যবস্থা **'মুক্ত অর্থনীতি'** ও **'বিশ্বায়নের** নামে। আর এভাবে পৃথিবী বার বার পুরানো অবস্থার দিকেই ফিরে যাচ্ছে। সভ্যতার উন্নতির নামে শাসক ও শোষকের হাত বদল ছাড়া অন্য কিছুই ঘটছে না। দেখা যাক সভ্যতার দ্বন্দে পৃথিবী কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!

www.pathagar.com

সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং কোরআন

মানুষের ইতিহাস যতটা প্রাচীন তার সভ্যতা সংস্কৃতির ইতিহাসও ততটা প্রাচীন। নৃতাত্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করলে ঈমান আনতে হয় যে, মানব জাতি আজকের অবস্থায় পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত অসভ্য ও বর্বর ছিল। অন্যান্য পশুর মতই তারা জীবন যাপন ও বংশ বিস্তার করতো। তারা অজ্ঞ মূর্খ ছিল। তারা আকার ইংগিতে মনের ভাব প্রকাশ করতো কারণ তাদের নিজস্ব কোন ভাষা ছিল না। কিন্তু মহাগ্রন্থ আলকোরআন অধ্যয়ন করলে আমরা জানতে পারি যে, পৃথিবীর মানুষের প্রথম জোড়া আজকের মানুষদের ন্যায়ই সভ্য ও সংস্কৃতিবান ছিলেন। তাদের নিজস্ব ভাষা ছিল। উন্নত জীবনবোধ ও জীবন যাপন পদ্ধতি ছিল। আজকের মানুষ যেমন স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি নিয়ে পরিবার গঠন করছে তখনো তা বিদ্যমান ছিল। তারা উন্নত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। এ পর্যায়ে আমরা কোরআনের কিছু উদ্ধৃতি গ্রহন করতে পারি ঃ

"আল্লাহ তায়ালা যখন ফেরেশতাদের বললেন ঃ আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি পাঠাতে চাই। ফেরেশতারা বললো আপনি কি এমন কাউকে আপনার প্রতিনিধি বানাতে চান যারা আপনার জমিনে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করে বেড়াবে। আপনার তাসবীহ পড়া ও পবিত্রতা বর্ণনা করার জন্য তো আমরাই আছি। আল্লাহ্ তায়ালা বললেন ঃ আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। আল্লাহ তায়ালা তারপর (তাঁর) প্রতিনিধি আদমকে সব ধরণের জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন। পরে তিনি তা ফেরেশতাদের কাছেও পেশ করে বললেন ঃ তোমরা এ নামগুলো বলতো? ফেরেশতারা বললো একমাত্র আপনিই (সকল দোষ ত্রুটিমুক্ত এবং) পবিত্র, আমরা তো শুধু সেইটুকুই জানি যা আপনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। সব কিছুর জ্ঞানতো একমাত্র আপনারই জানা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এবার আদমকে বললেন সে সব জিনিসের নাম ফেরেশতাদের বলে দিতে। আদম ফেরেশতাদের নামগুলো বলে দিলেন।"

(আল বাকারা ঃ ৩০-৩৩)

"তিনিই মানুষ তৈরী করেছেন। (অতঃপর মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য) তিনি (আল্লাহ) তাকে কথা বলতে (ভাষা) শিখিয়েছেন।" (আর রহমান ঃ ৩-৪)

"আমি কি (ভালোমন্দ দেখার জন্য) মানুষকে দুটো চোখ দেইনি? (দেখার পর সে ভোগের জিনিসটার উপকারীতা অপকারীতা বোঝার ও বলার জন্য) আমি তাকে একটি জিহবা ও দুটো ঠোঁট দেইনি? (অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে দেখে আবার তা পরখ করে নেয়ার জন্য) আমি তাকে ন্যায় অন্যায়ের দুটো সুস্পষ্ট পথ বলে দেইনি?" (আল বালাদ ঃ ৮-১০)

www.pathagar.com

"শপথ করছি আত্মার ও তার যথাযথ বিন্যাসের এবং যে বিন্যাস দিয়ে, মানবীয় আত্মার ন্যায় অন্যায়ের (স্বভাবজাত) জ্ঞান টুকু আল্লাহ প্রদান করেছেন।"

(আল শামস ঃ ৭-৮)

"আল্লাহ মানুষকে কলমের সাহায্যে (যাবতীয়) জ্ঞান বিজ্ঞান (ও তত্ত্বকথা) শিখিয়েছেন। তাকে এমন সব কিছুর জ্ঞান শিখিয়েছেন যা (তিনি না শিখালে) সে মানুষটি তার কিছুই জানতে পারতো না।" (আল আলাক্ব ঃ ৪-৫)

"অতপর এক সময় যখন তারা উভয়ই সেই গাছ ও তার ফল আস্বাদন করলো, তখন তাদের লজ্জাস্থান সমূহ তাদের উভয়ের সামনে খুলে গেলো। সাথে সাথে তারা জান্নাতের বিভিন্ন গাছপালার পাতা নিজেদের ওপর জড়িয়ে নিজেদের গোপন স্থান সমূহ ঢাকতে শুরু করলো।" (সূরা আরাফ)

এ সবই কোরআনের বাণী এবং মানব সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ের কথা। এ থেকে আমরা জানতে পারলাম মানুষের সংস্কৃতিগত ও সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতির দুই স্তম্ভ–'জ্ঞান ও ভাষা' আল্লাহ সৃষ্টির আদিতেই মানুষকে শিক্ষা দান করেছেন। মানুষ তার সুপ্ত প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে এগুলোর উন্নতি ও উৎকর্ষতা সাধন করেছে মাত্র। এসব তাদের নিজস্ব আবিষ্কার বা উদ্ভাবন নয় বরং এগুলো তাদের প্রতি দয়াময় আল্লাহর দান। মানুষকে শুরু থেকে আল্লাহ তায়ালা জ্ঞানচর্চার পদ্ধতি শিখিয়েছেন, লেখা ও পড়ার ব্যবস্থাপনা করেছেন। তাদেরকে সৃষ্টিগতভাবেই ন্যায় অন্যায়ের বোধ দান করেছেন। ফলে মানুষ ভাল মন্দ উভয় হতে পারে। তারা নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ এবং দাংগা হাঙ্গামা ও যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতে পারে। এটি মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য।

আমরা আদম (আ) এর এক পুত্র কর্তৃক অপর পুত্রকে হত্যার কাহিনী থেকে মানুষের সত্ত্বায় বিদ্যমান 'ভাল ও মন্দ' প্রকৃতির সন্ধান পেয়ে থাকি। এ প্রসংগে কোরআনের বাণী ঃ "(হে মোহাম্মদ) তুমি এদের কাছে আদমের দুই পুত্রের গল্পটি যথাযথভাবে শুনিয়ে দাও। (গল্পটি ছিলো এই যে,) যখন তারা দুইজনই কোরবানী পেশ করলো আর তাদের মধ্যে একজনের কাছ থেকে কোরবানী কবুল করা হলো, (পক্ষান্তরে) আরেকজনের কাছ থেকে তা কবুল করা হলো না (যার কোরবানী প্রত্যাখ্যাত হলো) সে বললো-আমি অবশ্যই তাকে হত্যা করবো, (যার কোরবানী কবুল করা হলো), সে বললো-আল্লাহ তায়ালা তো শুধু মুত্তাকী লোকদের কাছ থেকেই (কোরবানী) কবুল করেন। (হিংসার বশবর্তী হয়ে) তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্যে আমার দিকে তোমার হাত উঠাও তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করার জন্যে তোমার প্রতি হাত উঠাবো না, কেননা আমি অবশ্যই সারা জাহানের মালিককে ভয় করি। (বরং) আমি চাইবো তুমি আমার গুনাহ ও তোমার গুনাহর (বোঝা) একাই তোমার মাথায় বয়ে নাও,

www.pathagar.com

এবং তুমি জাহান্নামের বাসিন্দা হয়ে পড়ো। (মুলত) জালেমদের এই হচ্ছে কর্মফল। শেষ পর্যন্ত তার কুপ্রবৃত্তি নিজ ভাইকে হত্যা করার জন্য উসকানি দিলো, সে তাকে খুন করে ফেললো এবং (খুন করে) সে ক্ষতিগ্রস্থদের দলভুক্ত হয়ে গেলো। অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন। কাকটি (হত্যাকারীর সামনে এসে) মাটি খুড়তে লাগলো, যেন তাকে দেখিয়ে দেয়া যায় কিভাবে তার ভায়ের লাশ মাটির ভিতরে লুকিয়ে রাখবে। কাকের একাজ দেখে সে নিজে নিজে বলতে লাগলো আমি তো এই কাকের চাইতেও অক্ষম। আমি তো আমার ভাইয়ের লাশটাও গোপন করতে পারলাম না। এভাবে সে নিজের কৃতকার্যের জন্যে অনুতপ্ত হলো। (আর পরবর্তী কালে) এই ঘটনার কারণেই আমি বনী ইসরাইলদের জন্য এই বিধান জারী করলাম যে, কোনো মানুষকে ধ্বংসাত্মক কাজ করার শাস্তি বিধান ছাড়া (অন্য কোন কারণে) কেউ যদি কাউকে হত্যা করে সে যেন জেনে রাখে যে) সে গোটা মানব জাতিকেই হত্যা করলো। আবার এমনিভাবে যদি কেউ একজনের প্রাণ রক্ষা করে, সে যেন গোটা মানব জাতিকেই বাঁচিয়ে দিলো। (কিন্তু বনী ইসরাইলদের অবস্থা হচ্ছে এই যে,) এদের কাছে আমার রাসুলরা তো সুস্পষ্ট আইন নিয়ে এসেছিলো, তারপরও এদের অধিকাংশ লোক এ জমীনের বুকে সীমালংঘনকারী হিসেবেই থেকে গেলো।" (আল মায়েদা ঃ ২৭-৩৩)

আমরা আদম (আঃ) এর দুই পুত্রের উপরোক্ত গল্প থেকে জানতে পারলাম যে, মানুষের সমাজে সভ্যতা ও বর্বরতা কোন প্রকার বিবর্তনের ফলাফল নয় বরং প্রকৃতিজাত বিষয়। আদম (আঃ) এর সন্তানদের মাঝেই মুত্তাকী ও খোদাদ্রোহী বিদ্যমান ছিল। হত্যার ন্যায় নিকৃষ্ট অপরাধ করতেও তারা লজ্জা বোধ করে নাই। নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের মতে মানুষের মৃতদেহ কবরস্থ বা সমাধিস্থ করার এ প্রথা সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির পরিচায়ক। অথচ আমরা দেখলাম আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়েই তাকে কাকের মাধ্যমে একাজটি শিক্ষাদান করেছেন। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও সভ্যতাগর্বী মানুষ অন্যায়ভাবে একে অন্যকে হত্যা করছে এবং মৃত্যুদন্ড রহিত করার জন্য আন্দোলন করছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা হাজার হাজার বছর আগে বিনাবিচারে অন্যায়ভাবে কোন মানব সন্তান হত্যাকে জগতের সকল মানুষ হত্যার সংগে তুলনা করেছেন এবং কারো প্রাণ রক্ষা করাকে গোটা মানব জাতির প্রাণ বাঁচানোর সংগে তুলনা করেছেন। সত্যি কতো উন্নত মানের সংস্কৃতি ও সভ্যতা আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষের জ্ঞান-প্রজ্ঞা, তাদের আবিষ্কার-উদ্ভাবন, জাতির সংগে জাতির মিলন তাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে উন্নতি দানের পাশাপাশি অবনতিও সাধন করেছে। আমাদের দেশ বর্তমানে

www.pathagar.com

বৈদেশিক সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার। প্রতিষ্ঠিত সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভেংগে ফেলছে। তাই এর বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠেছে, আন্দোলন হচ্ছে। মহান আল্লাহ তায়ালাও কোরআনে তাই বলেছেন। মানুষ একই সময়ে সভ্য ও অসভ্য হতে পারে। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেয়ার লোভ সামলাতে পারছিনা।

১৯৮০ সাল। একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানের জন্যে মাহাথির মোহাম্মাদের মালোয়েশিয়ায় গিয়েছিলাম। সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে আমাদেরকে সে দেশের সর্ববৃহৎ রাজ্য 'সারাওয়াক' নিয়ে যায়। সেখানে অবস্থানকালে রাজ্যের রাজধানী হতে ১২০ কিলোমিটার দূরে একদিন আমাদেরকে একটি আধুনিক গ্রাম দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রামটির অবস্থান ছিল সারাওয়াকের গভীর জংগলে অনেকগুলো কাঠ নির্মিত দোতলা ঘরে। আমরা সেখানে পৌছার পর আমাদের একটি সম্মেলন কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে নানা বয়সের নরনারী উপস্থিত ছিল। সম্মেলন শেষ হওয়ার পর আমি দেখতে পেলাম সেখানে উপস্থিত অনেক নারী তাদের পরনের কাপড়গুলো খুলে সম্পূর্ণ উলংগ হয়ে বেরিয়ে বনের দিকে চলে যাচ্ছে। এটাকে আমরা কোন্ সভ্যতা বলবো। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে যা বলা যায় তাহলো সভ্যতা ও বর্বরতা মানব ইতিহাসের শুরু থেকে হাত ধরাধরি করে চলছে। এর উন্নতি বা অবনতি সমাজের মানুষের আদর্শিক দৃষ্টিভংগি, তাদের জীবনবোধ, প্রাকৃতিক অবস্থান ইত্যাদি নানা উপাদানের উপর নির্ভরশীল। আর এ জন্যেই জংগলে বসবাসকারী মানুষগুলো শহর ও নগর সভ্যতার মানুষের ন্যায় হতে পারেনি। তারা পশুদের পাশাপাশি অবস্থান করে তাদের মতো জীবন ধারায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু আজকের উন্নত সভ্যতার দেশগুলোর শহর নগরে বসবাসকারী নর নারীরা যখন দিগম্বর হয়ে রাস্তায়, খেলার মাঠে কিংবা বিভিন্ন সমাবেশে উপস্থিত হয় তখন তাকে কি বলা যাবে -নিশ্চয় বর্বরতা ও অসভ্যতা।

সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে মানুষের দ্বারা লোহা ও তামার ব্যবহার, যোগাযোগের ক্ষেত্রে চাকার অবিষ্কার, প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ, নগরায়ন, শিল্পকলার উৎকর্ষতা ইত্যাদির আবিষ্কার ও সেগুলোকে মানুষের উপকার ও ভোগ-ব্যবহারে লাগানোর উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ আমরা কোরআনের পাতায় দেখতে পাই এসবই মহান আল্লাহ মানুষকে নিজ দায়িত্বে শিক্ষা দিয়েছেন। কোরআনের বাণী ঃ

"তিনিই (আল্লাহ) সমুদ্রকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন যেন তার মধ্য থেকে তোমরা তাজা (মাছ ও তার) গোশত খেতে পারো এবং তা থেকে মনিমুক্তার গহনা আহরন করো যা দিয়ে তোমরা অলংকৃত হতে পারো। তোমরা

www.pathagar.com

দেখতে পাচ্ছো, কিভাবে ওর বুক চিরে জলযানগুলো এগিয়ে চলে এবং (তাও এ কারণে যে) তোমরা এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার (রেজেকের) অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারবে। সবচাইতে বড়ো কথা তোমরা যেন তার এসব নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করো।" (আন নাহল ঃ ১৪)

"তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমাদের আরোহন (করা ছাড়া) শোভা বর্ধনের ব্যবস্থাও রয়েছে। (এ ছাড়াও) তিনি এমন (অনেক ধরনের জন্তু জানোয়ার) সৃষ্টি করেছেন যার (পরিমান ও উপযোগীতা) সম্পর্কে তোমরা এখন পর্যন্ত অবগত নও।" (আন নাহল ঃ ৮)

"আমি তার (দাউদ) জন্যে লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম, তাকে আমি এও বলেছিলাম যে, সেই বিগলিত লোহা দ্বারা তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী করো এবং সেগুলোর কড়া সমূহকে যথাযথভাবে সংযুক্ত করো, (হে দাউদের আপনজনেরা, এই শিল্পগত কলাকৌশলের পাশাপাশি) তোমরা তোমাদের নেক কাজকেও অব্যাহত রাখো কেননা তোমরা যা কিছুই করো না কেন, আমি তার সবকিছুই পর্যবেক্ষণ করি। এমনিভাবে আমি সোলায়মানের জন্যে বাতাসকে (তার) অনুগত বানিয়ে দিয়েছিলাম, (এই বাতাস তাকে দিগ-দিগান্তরে নিয়ে যেতো, তাই) তার প্রাতঃকালীন ভ্রমন ছিলো এক মাসের পথ, আবার সান্ধ্যকালীন ভ্রমনও ছিল একমাসের পথ (সমদীর্ঘ,) আমি তার জন্যে (গলিত) তামার একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করেছিলাম, তার মালিকের অনুমতিক্রমে জ্বিনদের কিছু সংখ্যক (কর্মী) তার সামনে থেকে (তার জন্যে) কাজ করতো, (আমি একথাও বলেছিলাম যে,) তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি আমার (ও আমার নবীর) আদেশ অমান্য করে, তাহলে তাকে আমি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাবো। (অতপর) সোলায়মান যা কিছু তৈরী করতে চাইতো তারা তার জন্যে তাই করে দিতো, (যেমন সুরম্য) প্রাসাদ, (নানা ধরণের) ছবি, পুকুরের ন্যায় থালা ও চুলার উপর স্থাপন করার উপযোগী বৃহদাকারের ডেগচী।" (সাবা ঃ ১৪-১৬)

এসবই মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশের সহায়ক। অতএব মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যিনি তা তার নবীদের মাধ্যমে দুনিয়ায় কার্যকরী করেছেন। মানুষ শুধুমাত্র তাদের জ্ঞান-প্রজ্ঞা দ্বারা এসব করতে সক্ষম হয়নি বরং আল্লাহর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এগুলি ঘটেছে। মানুষ তার ধারাকে এগিয়ে নিয়েছে। তারা এসব ক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটিয়েছে। আগেকার মানুষ যুদ্ধক্ষেত্রে ঢাল,তরবারী, তীর, ধনুক ইত্যাদি যেগুলো লোহা দিয়ে তৈরী হতো তা ব্যবহার করেছে। কিন্তু বর্তমানে মানুষ একই লোহা থেকে ট্যাংক, কামান, জংগী বিমান ইত্যাদি নির্মাণ করছে। এক্ষেত্রে মানুষ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন করেছে আল্লাহর দেয়া জ্ঞান এবং তাঁর

www.pathagar.com

দেখানো ও শিখানো পদ্ধতিতে। অতএব "শ্রমই মানুষকে সৃষ্টি করেছে" এ্যাঙ্গেলসের এ বক্তব্য সঠিক নয়। অনুরুপভাবে আজকের উন্নত সভ্যতা শুধুমাত্র মানুষের প্রচেষ্টার ফসল নয় বরং প্রধানত আল্লাহর দান এবং দ্বিতীয়ত মানুষকে প্রদত্ত জ্ঞান ও যোগ্যতার বিকশিত রুপ।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার তত্ত্ব ঃ কোরআনের ভাষায় আদিতে গোটা মানব জাতি একটি একক ও অভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতার উত্তরাধিকারী ছিল। কিন্তু তাদের বংশ বিস্তার ও অন্যান্য কারণে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়লে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতার উদ্ভব ঘটে এবং সময়ের ব্যবধানে কোনটি ধ্বংস হয়ে যায় আর কোনটি আরও উন্নত হয় এবং একটির সংগে অন্যটি মিলে নতুন নতুন সংস্কৃতি ও সভ্যতার জন্মলাভ ঘটে। এখানে আমরা নৃতাত্বিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে বুঝার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস চালাবো। তাদের মতে স্থান ও কাল নির্বিশেষ মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং সমাজের সদস্যগণ পারিপার্শ্বিক সমস্যার সমাধানের জন্য একটি একক কাঠামো (pattern) অনুসরণ করে। এই কাঠামোর উপাদানগুলো হলো সামাজিক সংগঠন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও কার্যাবলী, আইন, শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শন। এই সকল উপাদান নিয়ে গঠিত হয় একটি সাংস্কৃতিক কাঠামো। যখন কোন একটি গোষ্ঠী বা জাতি একই আচরণ করে, একই ধরণের রীতিনীতি, সামাজিক প্রথা মেনে চলে এবং একই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে তখন তাদের একই সংস্কৃতি ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়।

বিশ্বের সকল জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে যা অন্যদের থেকে আলাদা। মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে যে পার্থক্য তা তাদের সংস্কৃতির পার্থক্যের কারণে। আবার সংস্কৃতির পার্থক্য ঘটে থাকে সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত উপাদান সমূহের তারতম্যের কারণে। একই সমাজে বসবাস করেও সমাজের সদস্যগণ ভিন্ন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হতে পারে। উদারণত, হাজার বছর ধরে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানগণ এক গ্রামে বা একই পাড়ায় কিংবা একই দালানে বাস করছে কিন্তু তাদের জীবন ধারণ প্রনালী, আচার-আচরণ, সামাজিক প্রথা এমনকি ভাষা চয়নও ভিন্ন। এদেশের মানুষ যারা মুসলমান তারা পিতার ভাইকে চাচা বলে সম্মোধন করে কিন্তু হিন্দুগণ বলে থাকেন কাকা অথবা জেঠা। মুসলমানগণ পানি পান করে কিন্তু হিন্দুরা করেন জলপান। মুসলমান কখনো স্নান করে না গোসল করে, কিন্তু হিন্দুরা করে স্নান। মুসলমানগণ প্রস্রাব করে পবিত্রতা ও পরিছন্নতার উদ্দেশ্যে পানি কিংবা টয়লেট পেপার ব্যবহার করে কিন্তু হিন্দুগণ তা করেনা। মুসলমান খাতনা করে কিন্তু হিন্দুরা তা করেনা। হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝে এ ধরণের অসংখ্য পার্থক্য নিয়েও তারা যুগ যুগ ধরে একই সমাজ ও

www.pathagar.com

দেশে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করছে। এটা সম্ভব হয়েছে তাদের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় সহনশীলতার কারণে। কিন্তু নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে উল্লেখ করা হয়েছে মানুষের মৃত্যুচিন্তা থেকে ঈশ্বর ও ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে। আর সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের বিচারবুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনার ফসল। কোরআন এ তত্ত্ব সমর্থন করেনা বরং এ জাতীয় চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা কোরআনের দৃষ্টিতে একধরণের জাহেলিয়াত বা মূর্খতা, তা মানব ইতিহাসের শুরুতেও ছিল এবং আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।

সভ্যতা ঃ ঐতিহাসিক Walter wallbank এর মতে, সভ্যতা হলো সংস্কৃতির সমষ্টি। তাঁর ভাষায় --"Civilization the process and result of man's development from primitive Culture". ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিধ V. Gordon Childe এর মতে, সভ্যতা সংস্কৃতির রুপান্তরের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু উপাদান আবশ্যক। এগুলো হলোঃ লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন, ধাতব পদার্থের ব্যবহার, ওজন ও পরিমাপের উন্নত একক পদ্ধতি, গণিতের ব্যবহার, স্থাপত্যকর্ম নির্মাণ, উন্নত ব্যবসায় বাণিজ্য, চাকাওয়ালা গাড়ি, বিশেষজ্ঞ কারিগর ও শিল্পী, সেচ প্রযুক্তির ব্যবহার, লাঙলের ব্যবহার ও উদ্বৃত্ত ফসল উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদি। এসবই সত্য কিন্তু যা সম্পূর্ণ সত্য নয় তাহলো, ..আদিম সমাজ ব্যবস্থা থেকে সভ্যতার উত্তরণের প্রক্রিয়া ছিল ধারাবাহিক। সেই ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে গ্রাম ভিত্তিক কৃষি নির্ভর অর্থনীতি এবং মানুষের জীবনধারা-ক্রমশ উত্তরণের মাধ্যমে উন্নত সংস্কৃতি গড়ে তোলে। এক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য হলো মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। তার জন্য উন্নত জীবন পদ্ধতি নাজিল করা হয়েছে। যারা সে অনুযায়ী কাজ করছে, তার উপর ভিত্তি করে তাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে উঠেছে। আর সে চিন্তা- চেতনা থেকে সরে গিয়ে ভিন্ন চিন্তা ও পথ অনুসরণের ফলে এক্ষেত্রে হাজারো ভিন্নতা দানা বেধে উঠেছে। উদাহরণত, একই পাড়ায় বা গ্রামে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গের সাংস্কৃতিক অবস্থান এক নয়, আর এটা হচ্ছে তার জ্ঞানগত ও সামাজিক অবস্থার ভিন্নতার ফলশ্রুতি। এটা কোন রুপান্তরের ফসল নয়।

এক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, সকল সংস্কৃতিই সভ্যতা নয়। উদাহারণ স্বরুপ, ৭০০০ খ্রিঃ পূর্বের দিকে নিকট প্রাচ্যের কৃষি সম্প্রদায় ধাতুর ব্যবহার জানতো কিন্তু সে সংস্কৃতিকে সভ্যতা বলা যায় না। অন্যদিকে প্রাচীন ইলকা ইন্ডিয়ানদের কোন লিখন পদ্ধতি ছিল না। অথচ তারা একটি উচু মাপের সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল যাকে সভ্যতা বলা চলে। এক্ষেত্রে আমাদের আশপাশ থেকে দৃষ্টান্ত গ্রহন করে বলা যায়, বিভিন্ন উপজাতিদের নানাবিধ

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক কার্যাবলী রয়েছে যেগুলি বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত কিন্তু তাই বলে কেউ তাদেরকে সভ্যতা নামে অভিহিত করে না। অপ্রাসংগিকভাবে এখানে অন্য একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে আর তাহলো আমাদের দেশে ব্রিটিশ পদ্ধতির গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ব্রিটিশরা নির্বাচনে হেরে গেলে যারা জয়ী হয় তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়, পক্ষান্তরে আমাদের দেশে কারচুপির অভিযোগ এনে সরকারকে বয়কট করা হয়। কারণ আমাদের গণতন্ত্র কাগুজে, আর তাদের হলো সংস্কৃতি ও সভ্যতাগত।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়, নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণ সংস্কৃতি ও সভ্যতার যে ব্যাখ্যা দাড় করিয়েছেন তা অনুমানসিদ্ধ ও জড়বাদী। তাদের ব্যাখ্যায় সংস্কৃতি ও সভ্যতার অনেক উপাদান বিদ্যমানও রয়েছে, কিন্তু প্রকৃত সত্য তাতে স্থান পায়নি। কারণ তারা মানুষকে যেমন বানরের বিবর্তিত উত্তর পুরুষ হিসেবে চিত্রিত করেছে, তেমনি মানুষের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকেও বাদরামীর বিবর্তনের ফসল হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এক্ষেত্রে মানুষের পাশবিক অস্তিত্বকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে কোরআন মানুষের দেহ ও আত্মাকে সমন্বয় করেই তার জন্যে সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারণা ব্যক্ত করেছে, যা মহান আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে নবী রাসুলদের মাধ্যমে প্রেরণ ও প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

www.pathagar.com

সভ্যতার উত্থান-পতনের কোরআনী দর্শন

ব্যক্তি মানুষের ন্যায় জাতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রেও উত্থান ও পতন এবং ভাংগা ও গড়া অংগাংগিভাবে জড়িত। জার্মান লেখক অসওয়াল্ড স্পেংলার ভারতীয়, গ্রীক , রোমান, পাশ্চাত্য ইত্যাদি সভ্যতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, প্রত্যেক সভ্যতা চারটি পর্যায় অতিক্রম করে। এ পর্যায়কে তিনি ঋতুচক্রের সাথে তুলনা করেছেন। পর্যায়গুলো হলো বসন্তকাল, গ্রীষ্মকাল, শরৎকাল ও শীতকাল। অর্থাৎ জাতি ও সভ্যতার উত্থান-পতন একটি প্রাকৃতিক নিয়মে বাধা। অতএব উত্থান হলে পতন আসবেই। উদাহরণত, এক সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এত বিস্তৃত ছিল যে, সেখানে সুর্য অস্ত যেতনা। আর এখন তা ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের ক্ষুদ্র ভৌগোলিক সীমানায় আটকে আছে এক ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার প্রতীক হিসেবে। দ্বিমেরু কেন্দ্রীক বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন অস্তিত্বের লড়াইয়ে লিপ্ত। এক কেন্দ্রীক বিশ্বের স্বঘোষিত নেতা যুক্তরাষ্ট্র শক্তির জোরে আধিপত্যের লড়াইয়ে লিপ্ত। এখন তার বার্ধক্য। সাম্রাজ্যবাদী ধ্যানধারণা পরিত্যাগ না করলে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। এক্ষেত্রে সভ্যতার উত্থান পতন সম্পর্কে Toynbee এর মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন ঃ "Civilisations are born and Continue to grow so long as they are able to meet the Challenges of their times, but they decay when they fail to respond".

অন্যদিকে বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ এবং সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ তত্ত্বের প্রণেতা কার্লমার্কসের মতে অর্থনীতিই সমস্ত সভ্যতার গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে। উৎপাদন, বন্টন ও ব্যবহার এই তিনটি অর্থনৈতিক পদ্ধতির রুপ, সভ্যতার রুপ ও সভ্যতার ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তার মতে রোমান সৈন্যরা মিসরে আগমন করে নীল নদের তীরে উৎপন্ন গমের জন্য, রানী ক্লিওপেট্রার দৈহিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে নয়। তার সভ্যতা তত্ত্বে ধর্মের কোনো স্থান নেই। এছাড়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানীগন সভ্যতার উত্থান-পতন সম্পর্কে যেসব তত্ত্ব প্রদান করেছেন সেগুলোকে নানা ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো ভৌগোলিক তত্ত্ব, মৃত্তিকার অবক্ষয়জনিত তত্ত্ব, ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কিত তত্ত্ব, যাযাবর তত্ত্ব ও প্রতিকুলতার তত্ত্ব। এসব তত্ত্বের সত্যাসত্য নিয়ে কোন প্রকার প্রশ্ন না তুলেই বলা যায়, এগুলোই সবকিছু নয় বরং মূল কার্যকারণের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এসবই সভ্যতার উত্থান-পতনের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা মাত্র। এক্ষেত্রে মূল নিয়ামক শক্তি যিনি প্রকৃতিরও স্রষ্টা এবং

www.pathagar.com

মানুষেরও স্রষ্টা তাঁর ভূমিকা ও অবস্থানকে উপেক্ষা ও অস্বীকার করা হয়েছে। এ প্রসংগে আমরা এখন কোরআনে উপস্থাপিত সভ্যতার উত্থান পতন ও ভাংগা গড়ার খোদায়ী তত্ত্ব তুলে ধরতে সচেষ্ট হবো।

সভ্যতার উত্থান ও কোরআনী দর্শন ঃ আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ কোরআনে জাতি গোষ্ঠীর বিকাশ এবং সভ্যতার উত্থান ও পতন সম্পর্কে যে দর্শন ব্যক্ত করেছেন এখানে সে সম্পর্কে কতিপয় আয়াত তুলে ধরা হলো ঃ

"(হে নবী) তুমি বলো, হে আল্লাহ, হে বিশ্ব সাম্রাজ্যের অধিপতি তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করে থাকো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও, যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করো এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করো। যাবতীয় কল্যাণ ও মংগল কেবল তোমারই হাতে। নিশ্চয় তুমি সব বিষয়ে ক্ষমতাবান। তুমি রাতকে দিনের এবং দিনকে রাতের অভ্যন্তরে ঢুকাও, আর জীবিতকে মৃত এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করে আন। আর তুমি যাকে চাও বিনা হিসাবে জীবিকা দাও।" (আল ইমরান ঃ ২৬-২৭)

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ কৃর্তক মানুষকে নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনার যে বর্ণনা রয়েছে তাতে একটি মহাসত্যের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। সেই মহাসত্যটি হলো ঃ মানুষ ও প্রকৃতির স্রষ্টা, শাসনকর্তা ও বিধাতা একটি একক সত্ত্বা, মানুষ আল্লাহর পরিচালিত ও শাসিত এবং মহাবিশ্বেরই একটি অংশ বিশেষ। আল্লাহর আনুগত্য শধু মানুষ করে না বরং গোটা বিশ্ব প্রকৃতিই আল্লাহর অনুগত ও আজ্ঞাবহ। আর সর্বব্যাপী আনুগত্য থেকে কারো বিচ্যুত হওয়া বোকামী ও ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে তার নিঃশর্ত আনুগত্য ও অনুসরণের মধ্যেই সামগ্রীক মংগল ও কল্যাণ নিহিত। আল্লাহর ঘোষণা ঃ

"আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতোক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো জাতির (নৈতিক অবক্ষয়ের) জন্যে (তাদের ওপর) কোনো বিপদ পাঠাতে চান তখন তা রদ করার কেউই থাকে না, তিনি ব্যতীত ওদের কোনো সাহায্যকারী থাকতে পারে!" (আর রা'দ ঃ ১১)

উপরোক্ত আয়াতের প্রথম অংশে মহান আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির উন্নতি অগ্রগতির জন্য তাদের নিজেদেরকেই এগিয়ে আসতে আহবান জানিয়েছেন। মানুষ নিজেদের কাজ, চরিত্র, সামাজিক অবস্থা ও চিন্তাধারা পরিবর্তন না করা পর্যন্ত আল্লাহ তার সমৃদ্ধি কিংবা দুরবস্থাকে, সম্মান কিংবা লাঞ্চনাকে এবং মহত্ব কিংবা হীনতাকে দুর করেন না। তাদের চিন্তা ও কর্মের পরিবর্তন অনুপাতে তাদের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করেন, যদিও আল্লাহ তাদের ভবিষ্যত সর্ম্পকে জানেন। তাদের নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট পরিবর্তন

www.pathagar.com

অনুসারেই পরবর্তী সময়ে তিনি তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটান। এভাবে আল্লাহ মানুষের উপর কঠিন ও কঠোর দায়িত্ব অর্পন করেছেন। এটাই আল্লাহর রীতি এবং এটাই আল্লাহর ইচ্ছা। এখানে মানুষের ভাগ্যকে অদৃষ্টের হাতে নয় বরং তাদের চেষ্টা প্রচেষ্টার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

আয়াতের দ্বিতীয় অংশে মানুষের ধ্বংস ও পতনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে জাতি অকল্যাণ ও ধ্বংস কামনা করে, যারা নিজেরাই নিজেদের কাজ কর্মের মাধ্যমে অধঃপতনের যোগ্য করে তোলে আল্লাহ তাদের পতনকে অনিবার্য করে তোলেন। তাদের পতন দুনিয়ার কোনো শক্তি ঠেকাতে পারে না।

এসব আয়াতে মানব জাতির উত্থান ও পতনের প্রক্রিয়ার অনবদ্য চিত্র অংকন করা হয়েছে। এখানে মানুষকে অসহায় করে রাখা হয়নি। তাদের ভাগ্যের ভাংগা গড়ার দায়িত্ব তাদের উপর অর্পন করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ তায়ালা রেফারীর ভূমিকা পালন করছেন মাত্র। এ প্রসংগে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলি প্রনিধানযোগ্যঃ

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলেস্থলে (সর্বত্র আজ) বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, (তার অপরিহার্য পরিনাম হিসেবে) আল্লাহ তায়ালা তাদেরই কতিপয় কাজকর্মের জন্যে তাদের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাতে চান, যাতে করে তারা (সে সব কাজ থেকে) ফিরে আসে।" (রোম ঃ ৪১)

"আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির কাছে কোনো না কোনো রসুল পাঠিয়েছি, যাতে করে (এই কথার ঘোষণা দেয়া হয় যে) তোমরা এক আল্লাহর ইবাদাত করো এবং (আল্লাহর) নাফরমান শক্তিসমূহকে বর্জন করো, সে জাতির মধ্যে অতপর আল্লাহ তায়ালা কিছু লোককে হেদায়াত দান করেন আর কতক লোকের ওপর গোমরাহী চেপে বসে গেছে। অতএব (হে মানুষ) তোমরা আল্লাহর জমিনে পরিভ্রমণ করো এবং দেখো যারা (রাসুলদের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের কি ভয়াবহ পরিনাম হয়েছিল।" (আন নাহল ঃ ৩৬)

মানুষের আচরণ অত্যন্ত বিস্ময়কর। তারা ধ্বংসের মাঝে ডুবে থেকেও তা থেকে বের হয়ে আসার জন্য উদ্যেগী হয়না। আল্লাহ নবী রাসুল পাঠিয়ে তাদেরকে মুক্তি ও সত্যের পথে অর্থাৎ তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্যের পথে আহবান জানিয়েছেন। কিন্তু তারা উল্টো পথে চলে ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু যারা তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে নবীদের দেখানো পথ এখতিয়ার করেছে তিনি যুগে যুগে দুনিয়ায় তাদের প্রতিষ্ঠা দান করেছেন এবং আখেরাতেও তাদের নাজাত ও পুরষ্কার নিশ্চিত করেছেন। আল্লাহর বাণী ঃ

www.pathagar.com

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সে অনুযায়ী নেক কাজ করে তাদের সাথে আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা হচ্ছে এই যে, তিনি জমীনে তাদের অবশ্যই খেলাফাত দান করবেন যেমনিভাবে তিনি তাদের আগের লোকদের এ খেলাফাত দান করেছিলেন। (সর্বোপরি) যে জীবন বিধানকে (সভ্যতা ও সংস্কৃতি) তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন তাকেও তাদের জন্যে (সমাজে) সুদৃঢ় করে দেবেন তাদের (ভয় ও আতংকের বর্তমান) অবস্থাকে (নিরাপত্তা ও) শান্তিতে বদলে দেবেন, (তবে এজন্যে শর্ত হচ্ছে) তারা (জীবনের সর্বক্ষেত্রে) শুধু আমারই গোলামী করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবেনা। যে (বা যারা নেতৃত্বের এই ওয়াদা সত্ত্বেও) তার নেয়ামতের নাফরমানী করে তারা (সত্যিই) গুনাহগার। (হে মুসলমানগণ) তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত দাও, রাসূলের আনুগত্য করো, আশা করা যায়, তোমাদের ওপর দয়া (ও অনুগ্রহ) করা হবে। কাফেরদের ব্যাপারে কখনো একথা ভেবো না যে, তারা জমীনে (আমাকে) অক্ষম করে দেবে। তাদের তো ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, কত নিকৃষ্ট এই ঠিকানা!" (আন নূর ঃ ৫৫-৫৭)

" আমি যদি এ মুসলমানদের আমার জমীনে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা দান করি, তাহলে তারা (প্রথমেই) নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, (দ্বিতীয়ত) যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করবে। তারা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং মন্দকাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে তবে মনে রাখতে হবে সব কাজের চূড়ান্ত পরিনাম একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালরাই এখতিয়ার ভুক্ত।' (আল হজ্জ ঃ ৪১)

সভ্যতার ইতিহাস মনযোগ দিয়ে পড়লে আমরা দেখতে পাবো যে, রাষ্ট্রক্ষমতা ও সভ্যতার উত্থান ও পতন একে অন্যের হাত ধরাধরি করে অগ্রসর হয়। বিশ্বের মুসলমানদের উত্থান পতনের ইতিহাস একটু লক্ষ্য করুন। হাজার বছর ধরে তারা অর্ধেক পৃথিবী শাসন করেছে আর জনগন তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে গ্রহন করে একটি জাতি সত্তা ও সভ্যতার রুপ পরিগ্রহ করেছে, আর আজও তা অন্য যেকোনো সভ্যতার চেয়ে অগ্রসর ও টেকশই হিসাবে বিদ্যমান। মুসলমানগন তাদের রাজত্বকালে যেসব দেশ বিজয় করেছিল পরে তাদের পতন যুগে ইংরেজ, ফরাসী, স্পেন, ইত্যাদি ইউরোপীয় জাতি তাদের পরাধীন করেছে। কিন্তু এ পরাধীনতা ছিলো ভৌগলিক, তাদের ঈমান ও সংস্কৃতি তারা দখল করতে পারেনি। সেসব দেশগুলো মুসলমানদেরই রয়েছে অথচ ইংরেজরা ইতিহাসের অংশে পরিণত হয়েছে।

অতএব জগতে রাজত্ব বলতে নিছক কর্তৃত্ব , প্রভাব, প্রতিপত্তি ও শাসনকে বুঝায় না বরং রাজত্ব বলতে এ সবই বুঝাবে যদি তা সংস্কার ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, নির্মাণ ও গড়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, মানব

www.pathagar.com

জাতির জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ নির্ধারিত আদর্শের বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এবং সেরা সৃষ্টি মানুষের জীবনকে এই পৃথিবীর বুকে পরিপূর্নতার শীর্ষে পৌছে দেয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং রাজত্ব ও কর্তৃত্ব আল্লাহর দান। আল্লাহ যাকে চান তাকে সেটা দান করেন। আল্লাহ সেই ব্যক্তি বা জাতিকে সেটা দান করেন যারা একনিষ্ঠভাবে তার দাসত্ব ও আনুগত্য করে। অন্য কোন মানুষকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে তাদের পূজা উপাসনা ও আনুগত্য অনুসরণ করেনা। রাজত্ব তিনি তাদেরকেই দান করেন যাদের ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত হন যে, তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করবে না। তারা সন্ত্রাস, দমন, পীড়ন করবে না, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে। কিন্তু সত্যের অনুসারীরা যদি কাগুজে বাঘে পরিণত হয় তবে তিনি অন্য জাতিকে তাদের উপর চাপিয়ে দেন। আর এ জন্যে তিনি এটা করেন যাতে সমাজতাত্ত্বিক ভাষায় প্রতিকুলতার মোকাবিলা করে তাদের টিকে থাকা ও পূণর্জাগরণ ঘটতে পারে। এছাড়া সৎ নেতৃত্বের অভাবে যখন জালেম নেতৃত্ব পৃথিবী ভরে যায় তখন তিনি এক অত্যাচারীকে দিয়ে অন্য অত্যাচারীকে শায়েস্তা করার জন্য ক্ষমতার হাত বদল করেন। অতীত ও বর্তমান ইতিহাসে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে কোরআনের বাণী ঃ 'যদি আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির একদলকে আরেক দল দিয়ে প্রতিহত না করতো তাহলে দুনিয়ার বুক থেকে (খৃষ্টান সন্যাসীদের) উপাসনালয় ও গীর্জা সমূহ বিধ্বস্থ হয়ে যেতো, ধ্বংস হয়ে যেত (ইহুদীদের) ইবাদাতের স্থান ও (মুসলমানদের) মসজিদসমূহ, যেখানে বেশী বেশী পরিমানে আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়া হয়'। আল্লাহ তায়ালা নিছক বস্তুবাদী শক্তিরও উত্থান ঘটান, আর তা এ জন্যে ঘটান যাতে আল্লাহ মানুষকে যে মেধা ও যোগ্যতা দান করেছেন তারা যেন তার সর্বোত্তম ব্যবহার করে খোদার এ দুনিয়ার সর্বত্র বিদ্যমান যাবতীয় সম্পদ ও সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে মানব সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি করতে পারে, মানুষের জীবনযাত্রাকে উন্নত করতে পারে এবং বস্তুগত অর্থে হলেও সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ ঘটাতে পারে এবং নব নব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে সৃষ্টি রহস্য উন্মোচন করতে পারে। আধুনিক বিশ্বের বিশ্বশক্তিগুলোর দিকে তাকালে আমরা খোদায়ী নীতির বাস্তবায়নের এ দিকটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো। অতএব দেখা যায় ব্যক্তি, সমাজও সভ্যতার সৃষ্টি ও পূণর্জাগরনের জন্য মানুষকে নিজেদেরকেই অগ্রসর হতে হবে। আর এক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা তাদের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে সহায়ক ভূমিকা পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সভ্যতার পতন ঃ সভ্যতার উত্থান ও পতনের কোরআনী দর্শন আলোচনাকালে উত্থানের সাথে সাথে পতনের বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত

www.pathagar.com

আলোচনা প্রয়োজন। কোরআন পতনের বিষয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। কেননা, মানব জাতি যখন উন্নতির শীর্ষে অবস্থান করে তাদের ভোগের পেয়ালা যখন উপচে পড়ে, তখন তাদের মানসপটে কখনো এ চিন্তার উদ্রেক হয় না যে, ক্ষণস্থায়ী জীবনের সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী। টাইটানিকের মতো ডুবতে শুরু করার আগে মানুষ বুঝতেই চায় না যে, উত্থান হলে পতনও হতে পারে। আজকের বিত্তবান ব্যক্তি ও জাতি আগামীকাল নিঃস্ব ফকীরে পরিণত হতে পারে। আজকের মহাশক্তিধর সাম্রাজ্যের আগামীকাল পতন হতে পারে। মুসলমানরা একদিন শৌর্যবীর্যের অধিকারী ছিল। তুর্কি খেলাফাতকালে পৃথিবীর এমন কোন নৌবন্দর ছিল না যেখানে তাদের জাহাজগুলো ভিড়তো না। আজকে এমন কোন দেশ নেই যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু ব্রিটিশ, ফ্রান্স ও রাশিয়ানদের ভাগ্যবরণ করতে তাদের আর কত বাকী! হয়তো খুবই সামান্য সময়! তখন তাদেরকে সাগরঘেরা দ্বীপের ভাগ্য বরণ করতে হতে পারে। এটাই প্রাকৃতিক বিধান। **'ইন্ডিয়ান মুসলমানস'** পুস্তকের লেখক **William Hunter** আক্ষেপ করে তার বইতে লিখেছেন, ১৮৫৭ সালের আগে ভারতের মুসলমানরা জানতো না কিভাবে গরীব হতে হয়, আর ১৮৫৭ সালের পর তারা জানেনা কিভাবে ধনী হতে হয়।

পতনের কোরআনী দর্শন ঃ

মহান আল্লাহ তায়ালা মানব সভ্যতার শুরু থেকে অনেক জাতিকে ধ্বংস করেছেন, আর তা করেছেন একটি সাধারণ নীতিমালা বা দর্শনের ভিত্তিতে। এ সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আলকোরআনে আল্লাহর ঘোষণা ঃ

"আমি এমন অসংখ্য জনপদকে নির্মূল করে দিয়েছি, যার অধিবাসীদের নিজেদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি মদমত্ত করে রেখেছিলো। (অথচ) এই হচ্ছে এদের ঘরবাড়ীগুলো (আজ তোমরা নিজের চোখেই দেখে নাও), এদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর (এসব জায়গায়) সামান্যই কোনো মানুষের বসতি ছিলো। (শেষ পর্যন্ত তাদের যাবতীয় সমৃদ্ধি ও ভূখন্ডের) আমিই মালিক হয়ে থাকলাম। (হে নবী,) তোমার মালিক কোন জনপদকেই ধ্বংস করেন না, যতোক্ষণ না সে (জনপদের) কেন্দ্রস্থলে কোনো নবী না পাঠান যে তাদের কাছে আমার আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করবে, (এটাও আমার নিয়ম যে,) আমি জনপদ সমূহকে কখনো বরবাদ করিনা, যতোক্ষন না সেখানকার অধিবাসীরা জালেম (হিসেবে পরিগণিত) না হয়ে যায়।" (আল কাছাছ ঃ ৫৮-৫৯)

এ আয়াতগুলোতে মানুষকে আল্লাহ তায়ালা যেসব নেয়ামত দান করেছেন, সেসব নেয়ামত ও সম্পদের গর্ব করা ও তার শোকর না করাকেই ধ্বংসের মুল কারণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তবে কাউকে ধ্বংস করার পুর্বে

www.pathagar.com

মহান আল্লাহর নীতি হলো জনপদবাসীদের সতর্ক করার জন্যে নবী প্রেরণ করতেন। নবীদের সাবধানবাণী উপেক্ষা করে জনপদের লোকেরা যখন অহংকারে মেতে থাকতো তখন আল্লাহর গজব এসে তাদের ধ্বংস করে দিতো। আমরা এ ক্ষেত্রে মিসর রাজ ফেরাউন ও তারই সময়ের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি কারুনের নাম উল্লেখ করতে পারি। প্রথমেই আমরা কারুনের গল্পটি পড়ে দেখি। আল্লাহর বাণী ঃ "নিসন্দেহে কারুন ছিলো মুসার জাতি (বনী ইসরাইলের) লোক, কিন্তু তা সত্বেও সে তাদের উপর ভারী জুলুম করেছিলো, অথচ আমি তাকে এত বিশাল পরিমানে ধনভান্ডার দান করেছিলাম যে, তার ভান্ডারের) চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার। একবার (এমন হলো যে) তার জাতির লোকেরা তাকে বললো, ধন সম্পদ নিয়ে এতো দম্ভ করোনা। কেননা আল্লাহ তায়ালা দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না এবং এই যে সম্পদ যা আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দিয়েছেন তা দিয়ে পরকালের কল্যাণ তালাশ করো এবং দুনিয়া থেকে সম্পদের যে (আসল) হিস্যা পরকালে নিয়ে যেতে হবে তাকে কখনো ভুলোনা আল্লাহ তায়ালা যেভাবে (ধন সম্পদ দিয়ে) তোমার প্রতি মেহেরবানী করেছেন তুমিও তাঁর পথে তা ব্যয় করে তাঁর বান্দাদের ওপর দয়া করো, ধন সম্পদের বাহাদুরী দিয়ে আমার জমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে যেয়োনা, কেননা আল্লাহ তায়ালা কখনো ফাসাদকারী লোকদের ভালবাসেন না। কারুন (একথা শুনে) বললো, এ (বিশাল) ধন সম্পদ আমার জ্ঞান যোগ্যতা বলেই আমার কাছে এসেছে, কিন্তু এ (মূর্খ) লোকটা কি জানতো না যে আল্লাহ তায়ালা তার আগে বহু জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন যারা শক্তি সামর্থে তার চাইতে ছিলো অনেক প্রবল এবং তাদের জমা ধন সম্পদও (তার তুলনায়) ছিলো অনেক বেশী। (শাস্তি দানকালে) কখনো অপরাধীদের তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না, (কেননা আল্লাহ তায়ালা) কারোই মুখাপেক্ষী নন। একদিন সে তার লোকদের সামনে (নিজের শান শওকতের প্রদর্শনী করার জন্যে) জাঁকজমকের সাথে বের হলো। (মানুষদের মাঝে) যারা পার্থিব জীবনের (ভোগ বিলাস) কামনা করতো তারা বললো, আহা! (কতো ভাল হতো) কারুনকে যা দেয়া হয়েছে তা যদি আমাদেরও থাকতো। আসলেই সে মহাভাগ্যবান ব্যক্তি। (অপরদিকে) যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা বললো ধিক তোমাদের (এই ধন সম্পদের) উপর, (বস্তুত) যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে এবং (সে ঈমান অনুযায়ী) নেক কাজ কর তাদের জন্যে তো আল্লাহ তায়ালার দেয়া পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ, আর তা শুধু ধৈর্যশীল ব্যক্তিরাই পেতে পারে। পরিশেষে আমি তাকে এবং তার (ঐশ্বর্য ভরা) প্রাসাদকে জমিনে গেড়ে দিলাম, তখন (যারা আক্ষেপ করেছিলো তাদের) এমন কোনো দলই (সেখানে)

www.pathagar.com

মজুত ছিলোনা যারা আল্লাহ তায়ালার (গজবের) মোকাবেলায় তাকে (একটু) সাহায্য করতে পারে, না সে নিজে নিজেকে (গজব থেকে) রক্ষা করতে পারলো! মাত্র গতকাল (সন্ধ্যা) পর্যন্ত যারা তার জায়গায় পৌঁছার (জন্যে) কামনা করেছিলো আজ সকাল বেলায়ই তারা এ চরম ধ্বংস দেখে বলতে লাগলো (আসলে আমরা তো ভুলেই গিয়েছিলাম যে) আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাহদের মাঝে যাকে চান তার জন্যে রিজিক বাড়িয়ে দেন আর যাকে চান (তার জন্যে) তাকে সংকীর্ণ করে দেন। যদি আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর তাঁর অনুগ্রহ না করতেন আমাদের তিনি (কারুনের মতোই আজ) জমীনের ভেতর পুঁতে দিতেন (হায়! আমরা এ কথাটাও ভুলেই গিয়েছিলাম যে,) কাফেররা এভাবে কখনো সফলকাম হয় না।" (আল কাছাছ ঃ ৭৬-৮৮)

এখানে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম জনগণের সাথে অত্যাচার ও নিপীড়নমূলক আচরণের ফলাফল কত ভয়াবহ হতে পারে। আর এ জুলুমের কারণ ছিলো কারুনের প্রাচুর্য যা তাকে দাম্ভিক করে দিয়েছিল। জগতের সকল বিত্তশালী দাম্ভিকের জন্যে সে একটি খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকলো। এবার আসা যাক মিসর রাজ দাম্ভিক ফেরাউনের কাহিনীতে যে নিজেকে খোদা হিসেবে দাবী করেছিল। কোরআনের বাণী ঃ

"ফেরাউন (আল্লাহর) জমীনে অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো। সে তার অধিবাসীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিলো, (এই বিভক্তির মাধ্যমে) সে তাদের একটি দলকে হীনবল করে রেখেছিলো, (একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে) সে তাদের পুত্রদের হত্যা করতো এবং নারীদের জীবিত রেখে দিতো, অবশ্যই সে ছিলো (জমীনে) বিপর্যয়কারী ব্যক্তিদের একজন। (ফেরাউনের এসব ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায়) আমি সে জমীনে যাদের দূর্বল করে রাখা হয়েছিল তাদের ওপর (কিছুটা) অনুগ্রহ করতে চাইলাম। (গোলাম থেকে উঠায়ে) তাদের আমি (সমাজের) নেতা বানিয়ে দিতে চাইলাম। (সর্বোপরি) আমি তাদের এ জমীনের উত্তরাধিকারীও বানিয়ে দিতে চাইলাম। (আমি এও ইচ্ছা করলাম যে) দেশে তাদের ক্ষমতার আসনে বসিয়ে দেবো এবং তাদের মাধ্যমে ফেরাউন, হামান ও তার সৈন্যসামন্তদের (আমার সে পরিকল্পনাকে সত্য করে) দেখিয়ে দেবো যে ব্যাপারে তারা রীতিমতো আশংকা করতো।"

(আল কাছাছ ঃ ৪-৬)

এমন দুঃসময় আল্লাহর নবী মুসার (আ) জন্ম হলো। তার মাধ্যমে আল্লাহর পরিকল্পিত দুর্বল জাতি ক্ষমতায় আরোহন করলো এবং প্রতাপশালী দাম্ভিক ফেরাউন তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে সাগরে ডুবে মারা গেলো। আল-কোরআনে আল্লাহর বাণী ঃ "ফেরাউন বললো, হে আমার পারিষদরা আমি তো

www.pathagar.com

জানি না যে, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ আছে, (অতপর সে তার প্রধানমন্ত্রী হামানকে বললো) হে হামান, যাও আমার জন্যে মাটিকে (ইট তৈরী করার জন্যে) আগুনে পোড়াও। অতঃপর (তা দিয়ে) আমার জন্যে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো, যেন আমি (তাতে উঠে) মুসার খোদাকে দেখে নিতে পারি, আমি অবশ্য তাকে মিথ্যাই মনে করি। সে এবং তার বাহিনীর লোকেরা অন্যায়ভাবেই (আল্লাহর) জমীনে অহংকার করলো, ওরা ধরে নিয়েছিলো ওদের কখনও আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না। অতপর আমিও তাকে এবং তার গোটা বাহিনীকে সাগরে নিক্ষেপ করলাম। (হে নবী) তুমি দেখো আমার সাথে বিদ্রোহ করলে জালেমদের পরিণাম কি ভয়াবহ হয়ে থাকে।"(কাছাছ ঃ ৩৮-৪০)

কারুন ও ফেরাউনের ঘটনা থেকে ব্যক্তির অহংকার ও দাম্ভিকতা দ্বারা কিভাবে জাতি ও সভ্যতা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তার উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার ব্যক্তির ভূমিকার কারণে সভ্যতার বিকাশের যে তত্ত্ব কিছু সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন, মুসার (আ) হাতে ফেরাউনের ধ্বংস, ইবরাহীমের হাতে নমরুদের ধ্বংস এবং মুহাম্মদ (সা) এর মাধ্যমে ইসলামী সভ্যতার বিকাশ এবং আব্রাহাম লিংকনের হাতে গণতন্ত্রের, মার্কস-এ্যাঙ্গেলস হাতে সমাজতন্ত্রের, নেপোলিয়ানের নেতৃত্বে ফ্রান্সের সাম্রাজ্য, কনফুসিয়াসের নেতৃত্বে চীনের উত্থান ও গৌতম বুদ্ধের নেতৃত্বে বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান সভ্যতার বিকাশে ব্যক্তিদের ভূমিকার স্বপক্ষে জোরালো সমর্থন প্রকাশ করে থাকে।

আলকোরআন আর যে সব কারণে সভ্যতার ধ্বংসের ইতিহাস বর্ণনা করেছে তাহলো নূহের (আ) জাতি ধ্বংস হয়েছে অবাধ্যতার কারণে, যৌন অবক্ষয়ের কারণে গ্রীস, ভারত ও রোমসহ অন্য অনেক জাতি ও সভ্যতাব ধ্বংস ঘটেছে। আজকের ইউরোপ ও আমেরিকাসহ তাদের প্রভাবিত জাতি এবং সভ্যতাগুলো একই কারণে ধ্বংসের প্রান্ত সীমায় উপনীত হয়েছে।

আমরা উপরোক্ত আলোচনার আলোকে জাতি ও সভ্যতাসমূহের ধ্বংসের কারণগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। এগুলো হলো ঃ

১। মানুষের স্বভাবজাত ঃ নৈতিক অধঃপতন, সমপদ ও ক্ষমতার গর্ব, বিলাসিতাও আলস্য, লোভ-মোহ ইত্যাদি।

২। বস্তুগত কারণ ঃ যুদ্ধবিগ্রহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জনবিদ্রোহ ও বাইরের আক্রমন ইত্যাদি।

৩। আসমানী গজব ঃ নুহের প্লাবন, ফেরাউনের সাগর ডুবি, লুতের জাতির অবলুপ্তি, কারুনের মাটি চাপা ইত্যাদি।

সভ্যতার উত্থান ও পতনে কোরআনী দর্শনের সারকথা সুরা আল আনআমের ৬নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে "এই (নির্বোধ) ব্যাক্তিরা কি দেখেনি যে, তাদের

www.pathagar.com

আগে আমি এমন বহু জাতি (ও তাদের জনপদ) কে ধ্বংস করে দিয়েছি (যারা খুব শক্তিশালী ছিলো), পৃথিবীতে তাদের এমনভাবে প্রতিষ্ঠা দান করেছি যা তোমাদেরও করিনি। আকাশ থেকে তাদের ওপর আমি প্রচুর বৃষ্টি বর্ষন করেছি, আর তাদের (মাটির নীচ থেকে পানি সরবরাহের জন্য) আমি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দিয়েছি। অতপর (যখন তারা আমার এসব নেয়ামতকে অস্বীকার করেছে, তখন)আমি তাদের এই পাপের জন্য চিরতরে ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের (ধ্বংসের) পর (তাদের জায়গায়) আমি আবার (সম্পূর্ণ এক)নতুন জাতির উত্থান ঘটিয়েছি।"

'সভ্যতার উত্থান-পতনে কোরআনী দর্শন' শীর্ষক আলোচনার শেষপ্রান্তে যা বলা যায় তাহলো মানুষের শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধ্যক্যের ন্যায় সভ্যতারও উত্থান-পতন ঘটে থাকে। এটি চক্রাকারে চলতে থাকে। এ প্রসংগে বিখ্যাত কবি Ralph Hodgson এর **"Time you old Gipsy Man"** কবিতা থেকে সভ্যতার উত্থান পতন সর্ম্পকে একটি উদ্বৃতি দিতে চাই ---

"Last week in Babylon,
Last night in Rome,
Morning, and in the crush
Under paul's dome;
Under paul's dial,
You tighten your reign--
Only a moment,
And of once again!
off to some city
Now blind in the womb.
off to another
Ere that's in the tomb."

এখানে সময় বা ইতিহাসকে সম্বোধন করে কবি সভ্যতার উত্থান-পতন তত্ত্বের কাব্যিক ও ছান্দিক বর্ণনা দান করেছেন এবং একে মানুষের জন্ম মৃত্যুর সংগে তুলনা করেছেন।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা ইসলামী সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা নবীদের নেতা জগতের এক নম্বর ব্যক্তি মুহাম্মদ (সাঃ) মদীনায় হিজরতের প্রাক্কালে আল্লাহ শিখানো ভাষায় যে দোয়া করেন যার উলেখ রয়েছে আলকোরআনে ইসরাইলে এখানে তার উল্লেখ করতে চাই ঃ

"তুমি (দোয়ার ভাষায়) বলো, হে আমার মালিক (যেখানে কেন) আমাকে সত্যের সাথে নিয়ে যেও এবং (যেখা

www.pathagar.com

করো না কেন পুনরায়) সত্যের সাথেই বের করে নিয়ো এবং তোমার কাছ থেকে আমার জন্যে একটি সাহায্যকারী রাষ্ট্রশক্তি প্রদান করো। তুমি ঘোষণা দাও, সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা (চিরতরে) বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অবশ্যই মিথ্যাকে বিলুপ্ত হতেই হবে।"

এখানে নতুন সমাজ সভ্যতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি হলো ১) রাষ্ট্রক্ষমতা ও (২) হিজরত । মহানবী (সা) হিজরত করে মদীনায় গমন করেন এবং নতুন সমাজ ও সভ্যতার পত্তন করেন, যা পরবর্তীতে বিশ্ব সভ্যতায় রুপলাভ করে। আর এ জন্যেই সভ্যতার সৃষ্টিতে রাষ্ট্র ক্ষমতার পাশাপাশি হিজরতের (Migration) গুরুত্ব অত্যধিক। হিজরত সর্ম্পকে একটি ইংরেজী প্রবাদ উল্লেখ করে এ বিষয়ের সমাপ্তি টানছি ঃ

"Civilization develops through migration."

www.pathagar.com

আলকোরআনের পাতায় সভ্যতার উত্থান-পতন

মহাগ্রন্থ আল কোরআন এক অর্থে ইতিহাস গ্রন্থ। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর আগমন পর্যন্ত গোটা মানব জাতির উত্থান-পতন, উন্নতি ও অবনতির ইতিহাস প্রয়োজনের আলোকে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত আকারে বর্ণিত হয়েছে। এখানে মানব জাতির ইতিহাসকে মূলত হক ও বাতিলের দ্বন্দ এবং এ দ্বন্দ সংঘাতের পরিণতি উপস্থাপন করা হয়েছে।

উত্থান ও পতনের এ ধারাবাহিকতায় আল্লাহর প্রেরিত নবী রাসুলগন ছিলেন সত্যের প্রতিনিধি, আর সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী ছিল তাদের প্রতিপক্ষ বাতিল পন্থী। পৃথিবীর দেশে দেশে যখনই মানুষ মহান আল্লাহকে ভুলে গিয়ে তাগুতী শক্তির দাসত্ব আনুগত্য শুরু করেছে, হেদায়াতের পথ হতে বিচ্যুৎ হয়ে গোমরাহীর পথ অবলম্বন করেছে তখনই মহান আল্লাহ তাদের হেদায়েতের জন্যে নবী অথবা রাসুল প্রেরণ করেছেন। কোরআনের ঘোষণা মতে এমন কোনো জনপদ নেই যেখানে আল্লাহ তায়ালা নবী প্রেরণ করেন নাই। এসব নবী ও রাসুলদের কেউ নবুওয়াতের দাওয়াতের পাশাপাশি রাষ্ট্র নায়কের দায়িত্বও পালন করেছেন, আর কেউ কেউ শুধু দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব আনজাম দিয়েছেন। নবী রাসুলগন একই সূত্রে গাথা ছিলেন। প্রথম মানুষ আদম (আঃ) ছিলেন প্রথম নবী, আর নবীদের সরদার মুহাম্মদ (সা) ছিলেন শেষ নবী। মানব জাতির উদ্দেশ্যে তাঁদের দাওয়াতের বিষয়বস্তু ছিল এক ও অভিন্ন। কোরআনের ভাষায় এ দাওয়াত ছিল ঃ

"তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো-- এবং আল্লাহর নাফরমান শক্তি সমূহকে বর্জন করো।" (আন নাহল ঃ ৩৬)

অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত সমাজ তাদের এ দাওয়াত মেনে নেয় নাই, ফলে কখনো উভয়ের মাঝে সংঘাত হয়েছে, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহ ফেরেশতা পাঠিয়ে কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে সেসব জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আমরা এখানে কোরআনের পাতা থেকে কতিপয় জাতির উত্থান ও কতিপয় জাতির পতন এবং বনিইসরাইলের উত্থান পতনের ইতিহাস তুলে ধরবো।

হযরত নূহ (আঃ) এর জাতির ধ্বংস ঃ

পৃথিবীর প্রথম মানব গোষ্ঠী আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) এর সন্তান-সন্ততি ও তাদের বংশধরদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। তারা ছিল একটি একক ও অভিন্ন জাতি। তারা এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যে লিপ্ত ছিল। কালক্রমে

www.pathagar.com

তাদের মাঝে গোমরাহীর আবির্ভাব ঘটে। তারা সত্য বিমুখ হয়ে এক আল্লাহর পরিবর্তে নিজ হাতে তৈরী মূর্তি সমূহের পূজা করতে শুরু করলো। এমনি অবস্থায় মহান আল্লাহ তাদের হেদায়াতের জন্য নূহ (আঃ) কে আদম (আঃ) এর পর প্রথম নবী হিসেবে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন। তাওরাতের বর্ণনামতে আদম (আ) এর সৃষ্টি ও নূহ (আ) এর জন্মের মাঝে ১০৫৬ বছরের ব্যবধান ছিল। আদম (আঃ) এর জীবনকাল ছিল ৯৩০ বছর।

আল্লাহর নবী নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য এবং সত্যদ্বীনের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তাঁর জাতি সে আহবানে সাড়া দিল না; বরং ঘৃণা ও অবজ্ঞার সাথে অস্বীকার করলো। সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করলো, নানাভাবে তাঁকে অপমান অপদস্থ করতে থাকলো। তাদের অনুসারীরাও একই পন্থা অনুসরণ করলো। এসব সমাজ নেতাগণ তাঁকে গরীব ও নীচ মর্যাদার আখ্যায়িত করে তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো। নূহ (আঃ) এর দাওয়াত ও তাঁর প্রতি তাদের অবজ্ঞার কাহিনী কোরআনের সুরা নূহ এবং সুরা হুদের (২৭-৩১) আয়াতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। নূহের জাতি যেসব দেব-দেবীর পূজা করতো সেগুলি হলো-- ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাস্‌র - এর মূর্তি । তাদেরকে এসব মূর্তির পূজা থেকে ফিরিয়ে আনার লক্ষে নূহ (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে তাঁর জাতিকে বলেন, "হে আমার জাতি! আমি তোমাদেরকে স্পষ্টরুপে ভয় প্রদর্শন করছি যে, আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় করো এবং আমার কথা মেনে চল, তাহলে তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যখন তা এসে পৌঁছাবে তখন আর অবকাশ দেয়া হবে না যদি তোমাদের বোধশক্তি থাকে। নূহ বললেন, হে আমার প্রতিপালক আমি নিজের জাতিকে দ্বীনের (ধর্ম) প্রতি আহবান করলাম রাত্রিকালে ও দিনের বেলায় কিন্তু আমার ডাকে তারা পলায়ন করতে লাগলো। আর যখন তাদেরকে আহবান করেছি যেন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তখন তারা নিজেদের কানে আঙ্গুল দেয় এবং নিজেদের উপর কাপড় মুড়ি দিতে লাগলো এবং বড় অহংকার করলো। অনন্তর আমি তাদেরকে ডাকলাম প্রকাশ্যে, আবার আমি তাদেরকে উচ্চঃস্বরে ডাকলাম এবং চুপি চুপি ডাকলাম। আমি তাদেরকে বললাম তোমাদের প্রতিপালকের নিকট নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো নিসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল।" (সুরা নুহ)

আল্লাহর নবী নূহ (আঃ) দীর্ঘ ৯৫০ বছর যাবত এ কষ্ট কঠিন দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যান, কিন্তু তাঁর জাতি তাকে হতাশ করেছে। "আর

www.pathagar.com

নূহের প্রতি ওহী প্রেরিত হলো যারা ঈমান আনার ছিল তারা এনেছে। এদের ব্যতীত আর যারা আছে তারা কেউ ঈমান আনবেনা। অতএব তাদের কার্যকলাপের জন্য দুঃখ করোনা" (হুদ ঃ ৩৬)। আর এভাবে নূহ (আঃ) জানলেন তাঁর অযোগ্যতা নয় বরং অমান্যকারীদের অযোগ্যতা এবং তাদের অবাধ্যতাই দাওয়াত গ্রহণ না করার কারণ তাই তিনি ব্যথিত হয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন " হে আমার প্রতিপালক! আপনি কাফেরদের হতে কাউকে জমিনের উপর অবশিষ্ট রাখবেন না। যদি আপনি তাদেরকে এভাবে ছেড়ে দেন তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে গোমরাহ করবে আর তাদের বংশধরও তাদের মত পাপিষ্ট ও নাফরমান হবে।" (নূহ ঃ ২৬-২৭)

মহান আল্লাহ তায়ালা নূহ (আঃ) এর দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁকে একটি নৌকা তৈরীর নির্দেশ দিলেন। নৌকা তৈরী শেষে সকল প্রকার জীব জন্তুর এক জোড়াসহ বিশ্বাসীদের নিয়ে সে নৌকায় আরোহন করতে বললেন, আর নির্দেশ দিলেন 'যাতে কোন জালিমের জন্য দোয়া না করা হয়। নিসন্দেহে তারা ডুবে মারা যাবে'। (হুদ ঃ ৩৭) বৃষ্টি ও ভূগর্ভের পানিতে দুনিয়া প্লাবিত হলো, ফলে নৌকার অধিবাসীরা ছাড়া সকল মানুষ মারা গেল এবং তাদের সংগে তাঁর পুত্র কেনানও ডুবে মরলো। নবীর পুত্র হলেও তাকে ছাড় দেয়া হয়নি। প-রিশেষে নূহের (আঃ) নৌকা জুদী পাহাড়ে গিয়ে ঠেকেছে। কোরআনের বাণী ঃ "আর আল্লাহ পাকের আদেশ পূর্ণ হলো এবং নৌকা জুদী পাহাড়ে গিয়ে থামলো, আর ঘোষণা দেয়া হলো যে, জালিম জাতির জন্য ধ্বংস।" (হুদ ঃ ৪৪)

এভাবে মানব ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের যবনিকাপাত ঘটলো মহাপ্লাবনের মাধ্যমে। তাদের নাম নিশানা দুনিয়ার ইতিহাস থেকে মুছে গেছে। আর এটা ঘটেছে আল্লাহর প্রতি তাদের অবাধ্যতার জন্যে। নূহের সাথে যারা বেঁচে থাকলেন আজকের মানব জাতি তাদেরই বংশধর। আর এ জন্যে নূহ (আঃ) কে দ্বিতীয় আদম নামে অভিহিত করা হয়।

আদ জাতির বিলুপ্তি ঃ

আদ একটি প্রাচীন জাতি। তাদেরকে নূহ (আঃ) এর পুত্র 'সামের' বংশধর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ জাতির উন্নতির যুগ হিসেবে খ্রিষ্টপূর্ব দু'হাজার বছর বলে অনুমান করা হয়। ঐতিহাসিকদের মতে তাদের কেন্দ্রস্থলে ছিল ওমান অথবা ইয়ামন। তাদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল হাযরামাউত ও ইয়ামানে পারস্য উপসাগরের তীরে ইরাকের সীমান্ত পর্যন্ত।

কোরআনের ঘোষণা অনুসারে তদানিন্তন জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী, ক্ষমতাবান ও সম্পদশালী ছিল কওমে আদ। মহান আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতার শাস্তি স্বরুপ তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। আল্লাহর

www.pathagar.com

বাণী ঃ "তুমি কি (ইতিহাসের এই ঘটনা) দেখোনি যে, তোমার প্রভু কিভাবে আদ জাতির ইরাম গোত্রের লোকদের সাথে ব্যবহার করেছেন। (এই জাতির লোকেরা ছিল) বড় বড় স্তম্ভ বিশিষ্ট প্রাসাদের অধিকারী। (জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের দিক থেকে) দুনিয়ায় তাদের চেয়ে উন্নত কোন জাতিই তার পূর্বে সৃষ্টি করা হয়নি।

(ফজর ঃ ৬-৮)

আদ জাতি ছিল মূর্তিপূজক। তারা নিজেদের রাজত্বে জাঁকজমক, দৈহিক শক্তির অহংকারে এতই মত্ত ছিলো যে, আল্লাহ পাককে একেবারেই ভুলে গিয়েছিল এবং নিজেদের হাতে গড়া মূর্তি সমূহকে মাবুদ বানিয়ে সকল প্রকার শয়তানী কার্যাবলী নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে করতে লাগলো। তখন মহান আল্লাহ তাদের হেদায়াতের জন্য তাদের মধ্য হতে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেন। এই পয়গম্বর হলেন আল্লাহর নবী হযরত হুদ (আঃ)।

হযরত হুদ (আঃ) তার জাতিকে আল্লাহর একত্ব এবং তাঁর ইবাদাতের প্রতি দাওয়াত দেন এবং মানুষের প্রতি অত্যাচার--অবিচার করতে নিষেধ করেন। কোরআনের ভাষায় ঃ

"সে (হুদ) বললো, হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার করো -- তিনি ছাড়া তোমাদের দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নেই।" (আরাফঃ ৬৫)

"এ দাওয়াত শুনে "তাঁর জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যারা তাঁকে অস্বীকার করেছে বললো আমরা তো দেখছি তুমি অত্যন্ত বোকামীতে লিপ্ত আছো। আমরা আরো মনে করি যে, তুমি মিথ্যাবাদীদেরই একজন।" (আ'রাফ ঃ ৬৬)

এতদসত্বেও তিনি তাদের নানাভাবে দাওয়াত দিতে থাকলেন, আল্লাহর আজাবের ভয় দেখালেন কিন্তু তারা দিনে দিনে তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং বললো, "তুমি কি আমাদের কাছে এ কথা বলার জন্যেই এসেছো যে, আমরা কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করবো এবং আমাদের পূর্ব পুরুষেরা যাদের বন্দেগী করে এসেছে তাদের একেবারেই বাদ দিয়ে দেব, (এটাই যদি হয় তোমার একমাত্র কথা) তাহলে নিয়ে এসো আমাদের কাছে সে আজাব যার ব্যাপারে তুমি আমাদের ভয় দেখাচ্ছো -- যদি তুমি সত্যবাদী হও।"(আরাফ ঃ ৭০)

অতঃপর তাদের উদ্ধত্য ও অহংকারের ফলশ্রুতিতে আল্লাহর আজাব তাদেরকে ঘিরে ফেললো। তাদের উপর একাধারে ৮ দিন ও ৭ রাত যাবৎ প্রবল বেগে ঝড় প্রবাহিত হলো। তাদেরকে ও তাদের লোকালয়কে ওলট পালট করে দিলো। শক্তিশালী ও সুঠাম আকৃতির মানুষগুলি বিশালকার নিষপ্রাণ বৃক্ষের ন্যায় মরে পড়ে থাকলো। তাদের অস্তিত্ব বিশ্বমানচিত্র থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেলো, রয়ে গেলো শুধু তাদের স্মৃতি জগতবাসীর শিক্ষার উদ্দেশ্যে। কোরআনের সুরা আল-মুমিনুন, হামীম সাজদা, আ'রাফ, হুদ সহ অনেক সূরায় আদ জাতির ধ্বংস ও নবী হুদ (আঃ) এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

আমরা কোরআনের এসব আয়াত সমূহ অধ্যয়ন করলে দেখতে পাবো কতো মমতা নিয়ে আল্লাহর নবী তাঁর জাতিকে সত্যের পথে, মুক্তির পথে দাওয়াত প্রদান করেছেন। তিনি অব্যাহত দাওয়াতের মাধ্যমে জাতির লোকেদের অন্তরে এ প্রত্যয় জন্মাতে চেষ্টা করলেন যে, 'আমি তোমাদের শত্রু নই বরং বন্ধু, তোমাদের নিকট আমি স্বর্ণ, রৌপ্য ও নেতৃত্বের প্রত্যাশী নই বরং তোমাদের মঙ্গল ও সাফল্য কামনা করি। আমি আল্লাহ পাকের দ্বীনের দায়িত্ব পালনে বিশ্বাসঘাতক নই বরং বিশ্বস্ত, আমি তাই বলি যা আমাকে আল্লাহ পাক নির্দেশ দেন। আমি যা কিছু বলি জাতির সৌভাগ্য এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের কল্যাণের জন্যই বলি এবং তোমাদের চিরস্থায়ী কল্যাণের জন্যই বলছি।' কিন্তু হায় এসবই তাদেরকে আরো অধিক হারে অহংকারী করেছে-বেপরোয়া করেছে এবং তারা নবীর সংগে বেয়াদবী করেছে, ফলে আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিলেন। এভাবে তারা হয়ে গেলো ইতিহাসের অংশ।

সামূদ জাতির ধ্বংস ঃ

আলকোরআনের বর্ননা অনুসারে আদ জাতির স্থলাভিষিক্ত হিসাবে আল্লাহ তায়ালা সামুদ জাতির উত্থান ঘটান। কোরআনের বাণী ঃ

" আর তোমরা ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ পাক তোমাদেরকে আদ জাতির পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করলেন এবং তোমাদেরকে জমিনের উপর স্থান দিলেন। ফলে তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে তার নরম অংশগুলোর উপর অট্টালিকা নির্মাণ করেছ।" (আ'রাফ ঃ ৭৪)

ইতিহাসের আলোকে সামূদ জাতির ধ্বংস আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীমের আবির্ভাবের পূর্বে ঘটেছিল বলে ধরা হয়। আল্লাহ তায়ালা সামূদ জাতিকে আদ জাতির স্থলাভিষিক্ত করেছেন। হেজাজ ও সিরিয়ার মধ্যস্থান ওয়াদিউল ক্বোরা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রান্তরটি ছিল তাদের আবাসভূমি। সামুদ জাতির আবাসভূমির ধ্বংসাবশেষ ও উহার চিহ্ন সমূহ আজো দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এ এলাকা মাদিয়ান শহর হতে দক্ষিণ পূর্বদিকে এমনভাবে অবস্থিত যে, 'আকাবা' উপসাগর তার সামনে পড়ে। আদ সম্প্রদায়কে যেমন 'আদেএরাম' বলা হয়েছে, তেমনি আদে এরামের ধ্বংসের পরবর্তী সম্প্রদায়কে সামূদে ইরাম বা দ্বিতীয় আদ বলা হয়েছে। কারো কারো মতে হযরত হুদ (আঃ) এর সংগে যারা রক্ষা পেয়েছিল তারাই পরবর্তীতে সামূদ জাতির উত্থান ঘটান। আর হাযরা মাউত বাসীর দাবি 'সামূদ জাতির বস্তি ও অট্টালিকা গুলো আদ জাতির কারিগরি ও শিল্পবিদ্যার ফলশ্রুতি'। আর সামূদকে 'দ্বিতীয় এরাম' বলার এ তত্ত্ব সত্য বলেই মনে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তার মিসরের ভাষণে বলেছেন, তাদের জাতি ও আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্ব মুসলমানদের রেখে যাওয়া জ্ঞান বিজ্ঞানের রাস্তা

www.pathagar.com

ধরেই গড়ে উঠেছে। এটাও সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে একটি থেকে অন্যটি গড়ে উঠার তত্ত্ব সমর্থন করে।

সামূদ সম্প্রদায় তাদের পূর্বপুরুষদের ন্যায় মূর্তিপূজক ছিল, তারা এক আল্লাহ ব্যতীত অসংখ্য মিথ্যা খোদার পূজা ও শিরকের মধ্যে লিপ্ত ছিল। তাদেরকে আল্লাহতায়ালা অনেক নেয়ামত দিয়ে ধন্য করেন। কোরআনের বাণীঃ "(এই সামুদরা কারিগরী বিদ্যায় এতো উন্নত ছিল যে, পাহাড়ের উপত্যকায় বিশাল বিশাল) পাথর কেটে সুরম্য অট্টালিকা এরা নির্মাণ করেছে।" (ফজর ঃ ৯)

মহান আল্লাহ তায়ালা সামূদ জাতির হেদায়েতের জন্য হযরত সালেহ (আ) কে নবী হিসেবে তাদের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগী করার দাওয়াত দান করেন। এ প্রসংগে কোরআনের বাণী ঃ "অতঃপর সামুদ জাতির কাছে আমি তাদেরই (এক) ভাই সালেহকে (নবী করে পাঠিয়েছিলাম)। সে (তাদের কাছে) এসে বললো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো - তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই।" (আ'রাফ ঃ ৭৩)

তাঁর জাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাকে নবী হিসেবে মানতে অস্বীকার করলো এবং তাঁর নিকট মোজেজা দাবী করলো। আল্লাহ তায়ালা মোজেজা হিসেবে একটি উস্ট্রীকে স্বাধীনভাবে জমিনে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তার কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করলে তাদেরকে আজাব দিয়ে ধ্বংস করা হবে বলে সাবধান করে দেন। কিন্তু সমাজের সরদার শ্রেণীর লোকেরা আল্লাহর ঘোষণা ও নবীর দাওয়াতের প্রতি কোন প্রকার কর্ণপাত না করে উল্টো "নিজেদের গৌরবের বড়াই করে বেড়াতো - অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রেণীর লোক যারা তাঁর ওপর ঈমান এনেছে - উদ্দেশ্য করে বললো তোমরা কি সত্যই জানো যে, সালেহ আল্লাহর পাঠানো একজন রাসুল! তারা বললো, (হাঁ) তাঁর ওপর যে বাণী পাঠানো হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি। অতপর (সেই) অহংকারী লোকেরা বললো, তোমরা যা কিছুতে বিশ্বাস করো আমরা তাকে অস্বীকার করি।" (আ'রাফ ঃ ৭৫-৭৬)

তারা এসব অবজ্ঞাসূচক কথা বলেই ক্ষান্ত হলোনা, উপরন্তু তাদের দাবীকৃত মোজেজার নিদর্শন হিসেবে প্রেরিত উষ্ট্রিটিকে তারা হত্যা করলো এবং নবীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে খোদার আজাব নিয়ে আসতে বললো। আল্লাহ তাদের অবাধ্যতা, অহংকার ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি হিসেবে ভয়াবহ ভূমিকম্পরুপে আসমানী আজাব প্রেরণ করলেন। এ পর্যায়ে কোরআনের বাণী ঃ "অতপর এক প্রলয়ংকারী ভূমিকম্প তাদের গ্রাস করে ফেললো। তারা নিজেদের ঘরেই মুখ থুবড়ে (ধ্বংসস্তুপে) পড়ে রইলো।" (আ'রাফ ঃ ৭৮)।

www.pathagar.com

এভাবে আল্লাহর অবাধ্যতার পরিণতিতে এক কালের শ্রেষ্ঠ সভ্যতার ধারক বাহক সামুদ জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তাদের এই ধ্বংস সভ্যতার উত্থান-পতনে প্রাকৃতিক বিপর্যয় তত্ত্বকে কিছুটা হলেও স্বীকৃতি দান করছে।

লূত জাতির ধ্বংস ঃ

আল্লাহর নবী লুত (আঃ) ছিলেন আল্লাহর অন্যতম বিশিষ্ট নবী ও রাসুল ইবরাহীম (আঃ) এর ভ্রাতুষপুত্র। আল্লাহ তায়ালা তাকে জর্দানের সাদুম এলাকার নবী হিসেবে প্রেরণ করেন। বর্তমানে যেখানে 'লুত সাগর' বা 'মৃত সাগর' অবস্থিত এটাই সে স্থান যেখানে 'সাদুম ও আমুরা' গোত্রদ্বয়ের বাসস্থান অবস্থিত ছিল। এ স্থানে অতীতে কোনো সাগর ছিল না কিন্তু আল্লাহর আজাবের পর তা সাগরে রুপ লাভ করে।

মিসর থেকে হিজরত করে এ এলাকায় বসবাস কালে লুত (আঃ) দেখতে পেলেন, সে এলাকার জনগণ আল্লাহর নানা প্রকার নাফরমানীর সাথে চরমতম অশ্লীল কাজে লিপ্ত। তিনি এ জাতির স্বভাব ও চরিত্রে অন্যান্য বহুমুখী পাপকর্মের সাথে এমন এক ধরনের অশ্লীল অভ্যাস আবিষ্কার করলেন যা ইতিপূর্বে জগতের কোনো জাতি গোষ্ঠীর মাঝে দেখা যায়নি। আর তাদের এ কুকার্যটি হলো তারা নিজেদের যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্য স্ত্রীলোকের পরিবর্তে দাড়িবিহীন বালকদের সাথে সহবাস করতো। এ কর্মটি 'লাওয়াতাত' বা সমকামীতা নামে খ্যাত। তারা এ কাজের জন্য কোন প্রকার লজ্জা বোধতো করতই না বরং প্রকাশ্যভাবে গর্ব সহকারে তা করতো। তারা ভরা মজলিশে নির্লজ্জের ন্যায় একাজ করতো। এ প্রসংগে আলকোরআনে আল্লাহর বাণী ঃ

" আর (স্মরণ করুন) লুতের ঘটনা, যখন সে তার জাতিকে বলেছিলো তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজে লিপ্ত রয়েছে যা পৃথিবীতে তোমাদের পূর্বে আর কেউ কখনো করেনি। তোমরা যৌন তৃপ্তির জন্যে নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছে যাও, আসলে তোমরা হচ্ছো এক সীমা লংঘনকারী জাতি।" (আ'রাফঃ ৮০-৮১)

আল্লাহর নবী লুত (আঃ) তার জাতির এহেন পশুসুলভ আচরণের জন্যে তাদেরকে তিরস্কার করলেন এবং সম্মান ও পবিত্রতার জীবন যাপন করার জন্যে তাদেরকে উৎসাহিত করলেন। অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর ধ্বংসের কারণ উল্লেখ করে তাদেরকে উপদেশ দিতে থাকলেন। কিন্তু হতভাগ্যদের উপর তার ওয়াজ নছিহতে কোনো প্রভাবই পড়লো না; বরং এর বিপরীত এ হলো যে, তারা বলতে লাগলো ---"তার জাতির কাছে এ কথা ছাড়া আর কোনো জবাবই ছিল না যে, সবাই মিলে তাদেরকে তোমাদের সমাজ থেকে বের করে দাও। (কেননা লুতের সাথী) এরা নিজেদের সতীত্ব বজায় রাখতে চায়।"(আ'রাফ ঃ ৮২)

www.pathagar.com

এটা ছিল মূলত লূত (আঃ) ও তাঁর পরিবারকে লক্ষ্য করে জালেমদের এক প্রকার তিরস্কার। আল্লাহর নবী তাতেও দমে গেলেন না। তিনি একটি বিরাট জনসমাবেশে তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ "তোমরাই কি ঐ সমস্ত লোক নও যে, তোমরা পুরুষদের সাথে অপকর্ম করছো, ডাকাতি করছো এবং নিজেদের মজলিসসমূহে এবং পরিবার বর্গের সামনে অশ্লীল কাজ করছো। (আনকাবুত ঃ ২৯)

জাতির লোকেরা এ উপদেশ শুনে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো এবং বললো লূত তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে খোদার আজাব নিয়ে এসো। এ প্রসংগে কোরআনের বানীঃ "অতপর তার জাতির জবাব তা ছাড়া আর কিছু ছিল না যে, তারা বলতে লাগলো, তুমি আমাদের নিকট আল্লাহর আজাব নিয়ে আস, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো।" (আন কাবুতঃ ২৯) মহান আল্লাহ তাদের ইচ্ছা পূরণ করলেন এবং ভয়াবহ আজাব দিয়ে গোটা জাতিকে মাটির তলায় তলিয়ে দেন। ফলে সেখানে জনপদের স্থলে সাগর সৃষ্টি হলো। এ প্রসংগে আল্লাহর ঘোষণা ঃ

"আমি তাদের ওপর প্রচন্ড আজাবের বৃষ্টি বর্ষণ করতে থাকলাম। সুতরাং তুমি চেয়ে দেখো আল্লাহর সাথে বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদের পরিনাম সেদিন কী ভয়াবহ হয়েছিল।" (আ'রাফ ঃ ৮৪)

আজকের যুগেও অনুরুপ নৈতিক অবক্ষয় ও দুষ্কর্মের ভয়াবহ পরিনামে ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্যতাগর্বী জাতি ও দেশ ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের ধ্বংস সময়ের ব্যাপার মাত্র। আমাদের প্রত্যাশা তারা ধ্বংসের এ পথ হতে ফিরে আসবে।

ইবরাহীম (আ) এর নবুয়াতের ধারায় সভ্যতার উত্থান-পতন ঃ

নবুয়াতের ধারায় মর্যাদাও শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নে শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর পরেই হযরত ইবরাহীম (আ) এর অবস্থান। গোটা কোরআন জুড়ে তাঁর বর্ণনা বিদ্যমান। তিনি ছিলেন হযরত ইসমাইল (আ) ও হযরত ইসহাক (আ) এর পিতা। ইসমাইল (আ) ছিলেন আরববাসীদের আদি পিতা, আর বনি ইসরাইল হলো হযরত ইসহাক (আ) এর বংশধর। ইবরাহীম (আ) ইহুদী বা খৃষ্টান ছিলেন না। তিনি ছিলেন খাঁটি মুসলমান। কোরআনের ঘোষণা ঃ

"ইবরাহীম ইহুদীও ছিলেন না, খ্রিষ্টানও ছিলেন না, অবশ্যই তিনি ছিলেন এক আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ মুসলমান।" (আল ইমরান ঃ ৬৭)

বর্তমান বিশ্বসভ্যতায় বিদ্যমান তিনটি প্রধান ধর্ম ইসলাম, খৃষ্টবাদ ও ইহুদীবাদ শুধুমাত্র ইবরাহীম (আঃ) এর নবুয়াতী ধারার সংগেই সংশ্লিষ্ট নয়, তাঁর রক্ত ও বংশধারার সংগেও বিজড়িত। আহলে কিতাব নামে পরিচিত ইহুদী ও খৃষ্টানগণ তাঁর পুত্র ইসহাক (আঃ) এর বংশধারার সংগে সম্পর্কযুক্ত। পক্ষান্তরে

www.pathagar.com

ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সা) তাঁর পুত্র ইসমাইল (আঃ) এর বংশধারার সংগে সম্পর্কযুক্ত। আর ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সা) যে ধর্ম প্রচার করেন তা ছিল ইসলাম এবং তাঁর অনুসারীদের তিনি নামকরণ করেন **মুসলমান**। এ পর্যায়ে কোরআনের বাণী ঃ

"(তোমরা প্রতিষ্ঠিত থেকো) তোমাদের (আদি) পিতা ইবরাহীমের দ্বীনের ওপর সে আগেও তোমাদের 'মুসলমান' নাম রেখেছিল"। (আল হাজ্জ ঃ ৭৮)

তাওরাতের বর্ণনা অনুসারে হযরত ইবরাহীম (আঃ) বর্তমান ইরাকে আজর নামক এক মূর্তি নির্মাতা ও মূর্তি পূজারী পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের পর তিনি দেখলেন যে, তার জাতি মূর্তিপূজা, নক্ষত্র পূজা এবং নানা প্রকার জড় বস্তুর পূজায় লিপ্ত রয়েছে। এক আল্লাহ ও তাঁর একত্ববাদ সম্পর্কে তাদের কোন প্রকার ধারনাই ছিলনা। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ তাদের হেদায়াতের জন্য ইবরাহীম (আ)কে পয়গম্বর হিসেবে প্রেরণ করেন। কোরআনে আল্লাহর বাণী ঃ

"নিঃসন্দেহে আমি ইবরাহীমকে প্রথম থেকেই হেদায়েত ও সৎপথের জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তার সম্পর্কে খুব অবহিত ছিলাম। যখন সে তার পিতা ও জাতিকে বললো এ মূর্তিগুলো কি? যা নিয়ে তোমরা বসে রয়েছে। তারা বললো আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের এগুলো পূজা করতে দেখেছি। ইবরাহীম বললো নিঃসন্দেহে তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষগণ প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত। তারা উত্তর করলো, তুমি কি আমাদের জন্য কোন সত্য নিয়ে এসেছ? নাকি এমনি বিদ্রুপকারীদের মতো বলছো? ইবরাহীম বললো, বরং তোমাদের প্রভু জমিন ও আসমান সমূহের সৃষ্টিকর্তা যিনি এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আর আমি এ বিশ্বাসই পোষণ করছি।" (আম্বিয়া ঃ ৫১ - ৫৬)

সত্যের প্রতি তার এ আহবানে তার জাতি সাড়াতো দিলই না, উপরন্তু তাকে উপহাস করতে লাগলো এবং আরো অধিক অবাধ্যতা ও নাফরমানী করতে শুরু করলো। ফলে পিতা ও পুত্রের মাঝে গরমিল দেখা দিলো এবং ইবরাহীম (আঃ) আযর থেকে পৃথক হয়ে ব্যাপকভাবে ধর্ম প্রচারে মনযোগ দিলেন। পর্যায়ক্রমে তাঁর দাওয়াতের বিষয়টি তদানিন্তন ইরাকের বাদশা-- যার উপাধি ছিল 'নমরুদ' তার কানে পৌছলো। 'নমরুদ' প্রজাদের শুধুমাত্র রাজাই হতো না; অধিকন্তু নিজেকে তাদের খোদা ও মালিক বলে দাবি করতো। প্রজারাও তাকে অন্যান্য দেবতার ন্যায় দেবতা জ্ঞানে পূজা করতো এমনকি দেবতাদের চেয়েও বেশী সম্মান করতো। নমরুদ ইবরাহীম (আ) এর নতুন ধর্মের কথা জেনে তাঁকে ডেকে পাঠালো এবং খোদায়ী সম্পর্কে নানা প্রশ্নবানে তাঁকে জর্জরিত করলো এবং বললো আমি এ জগতকে কারো সৃষ্টি বলে স্বীকার

www.pathagar.com

করিনা। এক পর্যায়ে সে ইবরাহীম (আ) কে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করলো। আল্লাহ আগুনকে নির্দেশ দিলেন --'ইবরাহীমের প্রতি নিরাপত্তাময় স্নিগ্ধ ও শীতল হয়ে যাও, আগুন তাঁর প্রতি স্নিগ্ধ ও শান্তিময় হয়ে গেল।' দুশমনরা তার কোন ক্ষতি করতে পারল না। হযরত ইবরাহীম (আ) জ্বলন্ত অগ্নিকান্ড হতে অক্ষত অবস্থায় বের হয়ে আসলে অনেক প্রত্যক্ষদর্শী তার সত্যধর্ম গ্রহণ করলো। নমরুদের হৃদয়েও ভাবান্তর ঘটেছিলো কিন্তু উজির তাকে বিপথে পরিচালিত করে। তারা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলো। তিনি সিদ্ধান্ত মোতাবেক ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য অনেক পথ অতিক্রম করে দাওয়াতী কাজ করতে করতে ফিলিস্তিন গিয়ে পৌঁছলেন। এ সময় সংগী হিসেবে তাঁর সাথে ছিলেন তার স্ত্রী সারা এবং লুত (আ) ও তার স্ত্রী। এ প্রসংগে কোরআনের বাণী ঃ " অতঃপর লুত ইবরাহীমের উপর ঈমান আনলো এবং বললো আমি আমার পালনকর্তার দিকে হিজরত করবো, নিঃসন্দেহ তিনি ক্ষমতাশালী বিজ্ঞানময়।" (আনকাবুত ঃ ২৬)

কিছুদিন ফিলিস্তিনে অবস্থানের পর তিনি মিসরে পৌছলেন। মিসরে অবস্থান কালে নানামুখী সমস্যার মোকাবেলা শেষে তিনি পুনরায় ফিলিস্তিনে ফিরে যান। এ সময় সারা (আ) এর খাদেমা হিসেবে প্রাপ্ত তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরা (আ) তার সংগে ছিলেন। নিঃসন্তান হযরত ইবরাহীম (আ) ৮৬ বৎসর বয়সে হাজেরা (আ) এর মাধ্যমে ইসমাইল (আ) এর পিতা হন এবং পরে সারা (আ) এর গর্ভে যখন অপর পুত্র জন্ম গ্রহণ করে তখন তার বয়েস ছিল ১০০ বছর এবং সারা (আ) এর বয়স ছিল ৯০ বৎসর। তার উভয় সন্তানকেই আল্লাহ তায়ালা নবুয়াত দান করেন। আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আঃ) শিশু ইসমাইল (আ) ও তার মা হাজেরা (আ) কে মক্কায় নির্বাসন দান করেন। তাদেরকে সেখানে নির্বাসিত করে ইবরাহীম (আ) আল্লাহর নিকট দোয়া করেন ঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার কতক বংশধরকে এমন এক ময়দানে রেখে গেলাম যেখানে কোন শ্যামলিমা নেই। বসবাসের কোন উপকরণ নেই। যেখানে কৃষির নাম চিহ্নও নেই, আপনার সম্মানিত ঘরটি তাওহীদের উপাসনাকারীদের হতে খালি না থাকে। অতএব আপনি এমন করে দিন যেন লোকদের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে যায়। এবং তাদের জন্য জমিন হতে উৎপন্ন শস্যাদি রিজিকের সরঞ্জাম প্রস্তুত করে দিন যেন তারা আপনার শোকর আদায়কারী হয়।" (ইবরাহীম ঃ ৩৭)

হযরত ইবরাহীম (আ) ফিলিস্তিনে অবস্থান করলেও মাঝে মাঝে মক্কায় স্ত্রী হাজেরা (আ) ও পুত্র ইসমাইল (আ) কে দেখতে যেতেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নির্দেশ দিলেন বায়তুল্লাহ নির্মাণ করার জন্য। পিতা পুত্র মিলে মরুভূমিতে কাবাঘর নির্মাণ করলেন এবং আল্লাহর নির্দেশে সেই নির্জন

www.pathagar.com

মরুভূমিতে বিশ্ববাসীকে আহবান জানান উক্ত ঘরের জিয়ারাতে গমনের জন্য। ইসমাইল এর কোরবানী এবং জমজমকুপসহ অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত মক্কা ও কা'বা বিশ্ব মুসলমানের তীর্থ কেন্দ্র। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্য তৈরী হয়েছে তা এটা যা মক্কায় অবস্থিত, বরকতওয়ালা এবং সমস্ত মানুষের জন্যে হেদায়েতের উৎস তার মধ্যে মাকামে ইব্রাহীম অন্যতম। এর দাঁড়াবার ও ইবাদাত করার স্থান যা সেকাল হতে আজ পর্যন্ত সন্দেহাতীতভাবে প্রসিদ্ধ ও নির্দিষ্ট রয়েছে। আর যে কেউ তার সীমার মধ্যে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা ও হেফাজতের মধ্যে এসে যায়। আর আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের জন্য এ বিষয়ে অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে যে, যদি সেই ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ প্রাপ্ত হয় তবে সে যেন হজ্জ করে। এত কিছু সত্ত্বেও যে একে অবিশ্বাস করে তবে স্মরণ রেখো আল্লাহ পাকের সত্বা বিশ্ব জাহান হতে অমুখাপেক্ষী।" (আল ইমরান ঃ ৯৬ - ৯৭)

আমরা ইতোপূর্বে জানতে পেরেছি যে, ইবরাহীম (আঃ) এর প্রথম স্ত্রী সারা (আ) এর গর্ভে তাঁর দ্বিতীয় সন্তান আল্লাহর নবী হযরত ইসহাক (আঃ) জন্ম নেন। তিনি তাঁর মায়ের সংগে ফিলিস্তিনে বসবাস করতে থাকেন। ইসহাক (আ) এর দুই ছেলের অন্যতম হলো আল্লাহর নবী ইয়াকুব (আ)। হযরত ইবরাহীম (আ) সারা (আ) ও হাজেরা (আ) ছাড়াও অন্য একটি বিবাহ করেন, যার নাম ছিল 'কাতুরা'। কাতুরার গর্ভে হযরত ইবরাহীম (আ) এর ৬ পুত্র জন্ম নেয়। হযরত ইবরাহীম (আ) ১২৫ বছর বয়সে জেরুজালেমে ইন্তেকাল করেন এবং তাঁকে বাইতুল মুকাদ্দাসে সমাহিত করা হয়। আর তাঁর ইন্তিকালের পূর্বেই তাওহীদের বাণী নিয়ে আল্লাহর একত্ববাদের ভিত্তিতে নতুন সভ্যতা গড়ার লক্ষ্যে তাঁর পুত্র প্রপৌত্রগন ছড়িয়ে পড়ে হেজাজ, শাম, ফিলিস্তিন এবং মিসরের বিস্তীর্ণ এলাকায়। তাঁর ইন্তেকালের পর একত্ববাদের ভিত্তিতে গঠিত তাঁর ধর্ম আরও প্রসারিত ও সংগঠিত রুপ লাভ করে এবং একটি স্থায়ী সভ্যতার রুপ পরিগ্রহ করে। দেশে দেশে এ সভ্যতার পতাকা যারা বয়ে নিয়ে যায় কোরআনের ভাষায় তারা হলো **বনি ইসরাইল**। শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নেতৃত্বে আরবের বুকে ইসলামী সভ্যতার সূচনা হওয়ার আগ পর্যন্ত তারাই ছিল বিশ্ববাসীকে হেদায়েতের পথে আহবান জানানোর বৈধ খোদায়ী প্রতিনিধি। খ্রিষ্টানরা তাদেরই বংশধর। আর উভয়কে কোরআন **আহলে কিতাব** নামে অভিহিত করেছে।

বনি ইসরাঈলের উত্থান ও পতন ঃ

হযরত ইয়াকুব (আ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ) এর পুত্র ইসহাক (আ) এর সন্তান। ইবরানী ভাষায় ইয়াকুব (আ) এর নাম ইসরাইল। ইসরা

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ আব্‌দ বা দাস এবং ইল অর্থ (আল্লাহ)। দুটি শব্দের সমন্বয়ে একটি যুক্তনাম ইসরাইল। ইসরাইল শব্দের আরবী সমার্থবোধক শব্দ হলো **আব্দুল্লাহ**। ইয়াকুব (আ) এর বংশধারায় গড়ে উঠা ইহুদী ও প্রাচীন খ্রিষ্টানগণ তার ইবরানী নামানুসারে বনি ইসরাইল নামে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করে। তাদের এ সভ্যতাকে নৃতাত্ত্বিকগণ **হিব্রু সভ্যতা** হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইয়াকুব (আ) কে কেনআনবাসীর হেদায়াতের জন্য নবী হিসেবে মনোনীত করেন। তাঁর পুত্র হযরত ইউসুফ (আ) একজন বিখ্যাত নবী ছিলেন। পবিত্র কোরআনের সুরা ইউসুফে নবী ইউসুফ (আ) এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কোরআন পরিবেশিত ইউসুফ কাহিনী হতে আমরা জানতে পারি যে, সৎ ভাইদের শত্রুতার ফলে অন্ধকার কুপে নিক্ষিপ্ত ইউসুফ ব্যবসায়ী কাফেলার মাধ্যমে দাস হিসাবে আজীজ মিসরের পরিবারে স্থান লাভ করেন। যৌবনে পৌঁছলে আজীজের সুন্দরী স্ত্রী জোলায়খা তার প্রেমে হাবুডুবু খেতে থাকার এক পর্যায়ে তাকে অনৈতিক কাজের প্রস্তাব করলে তিনি সেই কঠিন মুহূর্তে মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর ভবিষ্যত নবীকে উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করেন। আজিজের স্ত্রীর অসৎ ইচ্ছা পূরণ না হওয়ায় ইউসুফ (আ) কে সাত বছর যাবত কারাগারের অন্ধকারে জীবন কাটাতে হয়েছিল। অতপর মিসর সম্রাট ফেরাউনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করে তার আস্থা অর্জন করেন এবং কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে গোটা দেশের শাসনভার লাভ করেন। তিনি দেশের শাসনভার গ্রহণ করার এক পর্যায়ে তার পিতা ইয়াকুব (আ) সহ পরিবারের ৭০ সদস্য মিসরে গমন করেন এবং শাহী মেহমান হিসেবে জীবন যাপন করতে থাকেন। পরবর্তীতে ইউসুফ (আ) এর পরিকল্পনা মোতাবেক তাঁর খান্দানের লোকেরা মূর্তিপূজারী মিসরীয়দের থেকে আলাদা হয়ে রাজার অনুমতিক্রমে মিসরের একটি উর্বর কৃষি এলাকায় বসবাসের মূল রহস্য ছিল তাওহীদ ভিত্তিক জীবন ধারার স্বাতন্ত্র্য ধরে রেখে নতুন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করা।

হযরত ইউসুফ (আ) যখন মিসরে গমন করেন তখন মিসরে ফেরাউন সম্রাটদের শাসনকাল চলছিল। ফেরাউনদের এ খান্দানটি আমালেকাদের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ইতিহাসে এদেরকে 'হিকসূস' নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাদের আদি মূল হলো তারা রাখালদের একটি গোত্র ছিল। নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে জানা যায় এ গোত্রটি আরব থেকে মিসরে গমন করেছিল। তারা যাযাবর আরবদেরই একটি শাখা ছিল। এছাড়া প্রাচীন ক্বাবতী ও আরবী ভাষার পারস্পরিক সাদৃশ্য তাদের আরবী হওয়ার সঠিক প্রমান। এভাবে সভ্যতার বিকাশে আধুনিক নৃতাত্ত্বিক তত্ত্বও অনেকাংশ মিলে যায়।

www.pathagar.com

মিসরের ধর্মীয় কল্পনার ভিত্তিতে সে দেশের সম্রাটদের উপাধি ছিল 'ফারা' (ফেরাউন)। তখন মিসরীয় দেবতাদের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র দেবতা ছিল 'আ-মানরা' (সূর্য দেবতা)। তৎকালীন বাদশা তার অবতার এবং 'ফারা' নামে কথিত হতো। এ ফারাকেই হিব্রু ভাষায় **ফা-রাসান** এবং আরবী ভাষায় **ফেরাউন** বলা হতো। হযরত ইউসুফের সময় ফারা ফেরাউনের ব্যক্তিগত নাম ঐতিহাসিকগণ **'রাইয়ান'** বলেছেন। তার রাজত্বকাল খ্রিষ্টপূর্ব ১৬০০ সন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হযরত ইউসুফ (আ) ১১০ বৎসর বয়সে মিসরেই ইন্তেকাল করেন।

ইউসুফ (আ) এর মিসরে গমণের পর হতে ইয়াকুব (আ) এর বংশধরগণ কয়েক শতাব্দী যাবত সেখানে বসবাস করে। দিনে দিনে ইসরাইলীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাজে পরিনত হয়। ইসরাইলীরা সেখানে স্থানীয় জনগণের সংগে ভালোভাবেই বাস করছিল। কিন্তু তাদের সুখের দিন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। জামানার ফেরাউন ভাবলেন ইসরাইলীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে এক সময় স্থানীয় মিসরীয়রা সংখ্যালঘিষ্ট হয়ে পড়বে এবং রাজদন্ড ইসরাইলীদের হাতে চলে যাবে। এ চিন্তা থেকে ফেরাউনরা ইসরাইলিদের উপর জুলুম নিপীড়ন শুরু করলো। তাদেরকে দিয়ে নির্মাণ কার্যসহ নানা প্রকার কষ্টকর কাজ করাতে লাগলো। এক পর্যায়ে ফেরাউন দ্বিতীয় রামশীষের পুত্র ' মিনফাতাহ ' মিসরের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্টিত হয়। তার শাসন কাল ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ১২৯২ সন হতে খ্রিষ্টপূর্ব ১২২৫ সন। এ সময়টা ছিল বনি ইসরাইলের জীবনে সবচেয়ে দুঃখ ও বেদনাদায়ক। এই ফেরাউন ইসরাইলীদের কোনো ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহন করলে তাকে হত্যা করতো এবং কন্যা সন্তানদের দাসী বানিয়ে রাখতো। এসবের সম্ভাব্য কারণ ছিলো ইসরাইলীদের সংখ্যা হ্রাস ও তাদেরকে দাবিয়ে রাখা এবং 'মিনফাতাহ'র স্বপ্ন অনুসারে ইসরাইলী বংশের কোন এক বালক দ্বারা তার রাজত্ব হারানো ও মৃত্যুর ভয়। এহেন এক দুর্যোগকালে আল্লাহ তায়ালা বনি ইসরাইলীদের ত্রাণকর্তা হিসেবে মুসা (আ) কে প্রেরণ করেন। মুসা (আ) আল্লাহর অপার মহীমায় ফেরাউনের রাজপ্রাসাদে তারই তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন এবং যৌবনে মাদইয়ানে নবী শোয়াইব (আ) এর তত্ত্বধানে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। মাদইয়ান হতে পরিবার পরিজনসহ মিসরে ফেরার পথে তুরে সাইনা পর্বত শ্রেণীর নিকট পৌছলে তিনি আওয়াজ শুনতে পান---"হে মুসা! আমি আল্লাহ বিশ্বের পালনকর্তা।" (সুরা কাছাছ ঃ ৩০) "অতপর মুসা যখন আগুনের নিকট আসলেন তখন তাকে ডেকে বলা হয় নিসেন্দহে আমি তোমার প্রতিপালক। অতএব তুমি তোমার জুতা জোড়া খুলে ফেল, তুমি তুয়া নামক পবিত্র উপত্যকায় দন্ডায়মান রয়েছ। আর দেখ, আমি তোমাকে নিজের বাণী বহনের

www.pathagar.com

জন্য মনোনীত করেছি। অতএব, যা কিছু ওহী করা হয় মনযোগ দিয়ে শোন।" (ত্বাহা ঃ ১১-১৩) এভাবে আল্লাহ তায়ালা মুসা (আ) কে পয়গম্বর হিসেবে মনোনীত করে মোজেজা দিয়ে ফেরাউন ও তার দলবলের নিকট প্রেরণ করেন। কোরআনের বাণী ঃ "অতএব তোমার প্রভুর পক্ষ হতে ফেরাউন ও তার দলবলের মোকাবেলায় তোমার জন্য এ দুটি প্রমাণ। নিসেন্দেহে সে (ফেরাউন) ও তার দলবল নাফরমান জাতি।" (সুরা কাছাছ)

মুসা (আ) মিসরে পৌছে তার ভাই হারুনকে সংগে নিয়ে ফেরাউনের দরবারে পৌছে তাকে ও দরবারীদের আল্লাহর দাসত্বের দিকে আহবান জানান। তাদের দাবী অনুসারে মোজেজা প্রদর্শন করেন। তাদেরকে নানা পরীক্ষার সম্মুখীন করে মুসা (আ) এর মাধ্যমে সেসব দুর করে সত্যের পথে আসার সুযোগ করে দেন। কিন্তু এসবই তাদের হঠকারিতা অধিকতর বৃদ্ধি করে। এবং ফেরাউন খোদায়ী দাবী করে মুসার খোদাকে উঁচু দালানে উঠে মোকাবেলা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। মুসা (আ) ফেরাউন ও তার সভাসদদের মাঝে কোন প্রকার পরিবর্তন সাধন করতে ব্যর্থ হয়ে মিসর ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন এবং তার সংগে বনি ইসরাইলকে নিয়ে যাবার অনুমতি চাইলে ফেরাউন তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ ও পরিকল্পনা মোতাবেক মুসা (আ) ইসরাইলীদের নিয়ে আল্লাহর ইচ্ছায় সাগর পাড়ি দিয়ে ফিলিস্তিনে পৌছে যান। পক্ষান্তরে তাদের পশ্চাতধাবনকারী ফেরাউন তার দলবল নিয়ে সাগরে ডুবে মারা যায়। এভাবে আল্লাহর নবী মুসা (আ) এর নেতৃত্বে বনিইসরাইলের বন্দীদশার অবসান হলো, তাদের পূর্ব পুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের দেশে প্রত্যাবর্তন করে তারা নতুনভাবে জীবন যাপন ও সভ্যতার বিকাশে ভুমিকা রাখার সুযোগ লাভ করে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সভ্যতার কেন্দ্রভুমি জেরুজালেমে প্রবেশের নির্দেশ দিলে তারা অবাধ্যতা প্রকাশ করে, ফলে ৪০ বছর যাবত মরুভূমিতে অভিশপ্ত জীবন যাপন করতে হয়। অবশ্য মুসা (আ) এর ইন্তেকালের পর তারা হযরত ইউশা (আ) এর নেতৃত্বে জেরুজালেম জয় করলেন এবং আল্লাহর নির্দেশে ফিলিস্তিনকে নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেয়। এভাবে তারা প্রায় ৩৫০ বছর যাবত শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বাস করে এবং ধর্মের উন্নতি সাধন ও শৃংখলাপূর্ণ জীবন যাপন করে। এ সময় তাদের বিচার-আচার ও পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করতেন 'কাজীগণ'। আর নবী এসব কাজের তত্ত্বাবধান ও ধর্মপ্রচার করতেন। এ সময়ে তাদের কোন বাদশা ছিলনা এবং কোন না কোন কাজীকেই আল্লাহর পক্ষ হতে নবী নিয়োগ করা হতো।

কিন্তু ইসরাইলীদের এ শান্তিপূর্ণ অবস্থান আশে পাশের জাতিগুলো মেনে নিতে না পারায় নতুন করে যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হয় এবং এক পর্যায়ে তালুত ও

www.pathagar.com

জালুতের মধ্যকার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ) এবং তাঁর পরে তাঁর পুত্র সোলায়মান (আ) এর আবির্ভাব ঘটে। তারা দুজনেই নবী ও বাদশা ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা নানাভাবে তাদেরকে সম্মানীত করেছেন এবং তাদের নবুয়াত ও রাজত্বকালে ইসরাইলী সভ্যতার অবিস্মরণীয় উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে আমরা কোরআনের বাণীর আলোকে জানতে সচেষ্ট হবো। দাউদ (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ "আল্লাহ পাক তাকে রাজত্বও দান করেছেন এবং হেকমতও। আর তাকে নিজ ইচ্ছানুসারে যা ইচ্ছা করেছেন শিক্ষা দান করেছেন।" (বাকারাহ ঃ ২৫১)।

আল্লাহ এ প্রসংগে আরো বলেন ঃ "হে দাউদ নিঃসন্দেহে ভূপৃষ্ঠে তোমাকে আমার প্রতিনিধি বানিয়েছি।" (সুরা ছোয়াদ ঃ ২৬)

"আর আমি প্রত্যেককে (দাউদ ও সুলাইমান) রাজত্ব দান করেছি এবং জ্ঞান দান করেছি।" (আম্বিয়া ঃ ৭৯)

অর্থাৎ হযরত দাউদ (আ) বনী ইসরাইলীদের হেদায়াতের কাজও করতেন এবং তাদের সামাজিক বা সামগ্রিক জীবনের তত্ত্বাবধানও করতেন। তার পূর্ব পর্যন্ত ইয়াহুদার বংশে নবুয়াত এবং ইউসুফ (আ) এর বংশে শাসন ক্ষমতা ও রাজত্ব বিদ্যমান ছিল।

জ্ঞান, সাহসিকতা ও ন্যায় বিচারের জন্য প্রসিদ্ধ হয়রত দাউদ (আঃ) অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সিরিয়া, ইরাক, ফিলিস্তীন এবং পূর্ব জর্দানের সমগ্র এলাকা তার নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসেন। আর আক্বাবা উপসাগর হতে শুরু করে ফোরাতের সমগ্র এলাকা এবং দামেস্ক পর্যন্ত অঞ্চল তার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আধুনিক জাতিগুলোর ইতিহাস দর্শন অনুসারে **'আরব ঐক্য জোট'** কিংবা তার চেয়েও ব্যাপক একটি জোটের একক শাসক ছিলেন দাউদ (আ)। তিনি ন্যায় বিচার, সুশাসন, প্রভাব প্রতিপত্তি ও শান শওকতের অধিকারী ছিলেন। আর তিনি ওহীর জ্ঞানেও জ্ঞানান্বিত ছিলেন। এ প্রসংগে আল কোরআনের বাণী ঃ

"আর আমি তার রাজত্বকে মজবুত করে দিয়েছি। আর তাকে নবুয়াত দান করেছি এবং সঠিক মীমাংসার ক্ষমতা দান করেছি।" (ছোয়াদ ঃ ২০)

আল্লাহতায়ালা পর্বত শ্রেণী ও পক্ষীকুলকে তার অধীনস্থ করে দিয়েছিলেন। তারা দাউদের সংগে মিলিত হয়ে আল্লাহর তাসবীহ করতো। কোরআনের বাণী ঃ "আর নিঃসন্দেহে আমি দাউদকে নিজের তরফ হতে ফজীলত দান করেছি। হে পর্বত ও পক্ষীকুল! তোমরা দাউদের সাথে মিলিত হয়ে আমার তাসবীহ ও পবিত্রতা বর্ণনা কর।" (সাবা ঃ ১০)

হযরত দাউদ (আ) বাদশা হলেও অন্য বাদশাকুলের মত ছিলেন না। তিনি রাজভান্ডার হতে নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কোন প্রকার

www.pathagar.com

টাকা পয়সা গ্রহণ করতেন না। নিজে পরিশ্রম করে হালাল রিজিক অর্জন করে নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণ করতেন।

আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি অনুগ্রহশীল হয়ে লোহাকে নরম করে দেন এবং অতি সহজে লৌহবর্ম তৈরী শিক্ষাদান করেন। আল্লাহর বাণী ঃ
"আমি তার জন্য লৌহকে নরম করে দিয়েছি। নির্মাণ কর বর্মসমূহ এবং পরিমানমত জোড়া দাও কড়াসমূহ, আর তোমরা নেক কাজ কর। তোমরা যা কিছু কর আমি তা দেখছি"। (সাবা ঃ ১১)
"আর আমি তাকে শিখিয়েছি এক প্রকারের পোশাক নির্মাণ করা যেন তার সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের আত্মরক্ষা হয়। তোমরা শোকরকারী হবে।" (আম্বিয়া ঃ ৮০) "হযরত দাউদ (আঃ) এর ইন্তেকালের পর তার সুযোগ্য পুত্র হযরত সুলায়মান (আ) রাজত্ব ও নবুয়াত উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। আল্লাহ পাক বলেন ঃ "আর সুলায়মান দাউদের ওয়ারিস হলেন। তারা সবাই ছিলেন হযরত ইবরাহীমের (আ) বংশের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন ঃ আর আমি তাকে (ইবরাহীমকে) দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, আমি প্রত্যেককে হেদায়েত দান করেছি। আমি নুহকেও হেদায়েত দান করেছি। ইবরাহীমের পূর্বে আর ইবরাহীমের বংশের মধ্যে দাউদ এবং সোলায়মানকেও হেদায়াত দান করেছি।" (আনআম ঃ ৮৪)

শৈশবকাল থেকেই সুলায়মান (আ) তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি ও বিচারিক জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। তার জ্ঞান ও বিচারের জন্য তিনি জগতবিখ্যাত। আল্লাহ বলেন ঃ "নিঃসন্দেহে আমি দাউদ ও সোলায়মানকে ঈমান দান করেছি।" (নামল ঃ ১৫) তাঁকে আল্লাহর পক্ষ হতে পাখীদের ভাষা বুঝার জ্ঞান দান করা হয়েছে। আল্লাহর বাণী ঃ "আর সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হলো এবং সে বললো, হে লোকগণ আমাকে পাখিদের ভাষা সম্পর্কীয় জ্ঞান দান করা হয়েছে। আর আমাকে সকল বস্তুই দান করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে ইহা প্রকাশ্য দান।"(নামল ঃ ১৬) পাখি ছাড়া জ্বিন ও বাতাসকে সুলায়মান (আ) এর অধীনস্থ করে দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহ বলেনঃ "আর আমি সোলায়মানের জন্য বাতাসকে অধীনস্থ করে দিয়েছি, যা প্রাতঃকালে একমাসের পথ এবং সন্ধ্যাকালে এক মাসের পথ"। (সাবাঃ ১৪) অতএব সুলায়মান (আঃ) তার সিংহাসনে উপবিষ্ট লোকজন নিয়ে সকাল বিকাল যখন যেদিকে ইচ্ছা সেদিক যেতে পারতেন। এ যেন আধুনিক বিমান ব্যবস্থা। তিনি ঐতিহাসিক বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদ নির্মাণ করেন। বিশাল বিশাল অট্টালিকা নির্মানে অভ্যস্ত সোলায়মান (আ) কে তার কাজ সহজ করে দেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা গলিত তামার ঝরনা দান করেন। অর্থাৎ তিনি তামার ব্যবহারের ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন। ইয়েমেনে

www.pathagar.com

অবস্থিত সাবার রানী তার বশ্যতা স্বীকার করে। এক কথায় আল্লাহর নবী সুলায়মান (আ) ও তার পিতা নবী দাউদ (আ) এর নবুয়াত ও শাসনকালে ইসরাইলী সভ্যতা তার সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে আরোহন করে।

রাজত্ব লাভের কারণসমূহ ঃ দাউদ (আ) কে অল্লাহ তায়ালা 'যাবুর' কিতাব দান করেন এবং সোলায়ামন (আ) ছিলেন তারই উত্তরাধিকার। তারা আল্লাহ প্রদত্ত এই কিতাবের বিধান অনুসারেই রাজ্য শাসন এবং নবুয়াতের দায়িত্ব পালন করেন। আমরা এ প্রসংগে জাতি ও সম্প্রদায়ের রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা লাভের পন্থা সম্পর্কে দু'ধরণের ধারণা লাভ করে থাকি। প্রথমত, আল্লাহ পাকের উত্তরাধিকারীত্বের মাধ্যমে আর দ্বিতীয় প্রকার হলো পার্থিব কারণাদি ও উপলক্ষ্যের মাধ্যমে। প্রথম অবস্থায় তখনই কোন জাতিকে রাজত্ব দান করা হয় যখন তার আক্বীদা ও আমলের মধ্যে আল্লাহ পাকের উত্তরাধিকারীত্ব পূর্ণাংগভাবে কার্যকর হয়। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সাথে তার আক্বীদা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক বিশুদ্ধ ও খাঁটি হয় এবং সে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আমলসমূহেও এত ভালো এবং উন্নত স্তরে পৌছে যায় যে, কোরআনের ভাষায় তাকে 'ছালেহীনের' মধ্যে গণ্য করা যায়। এ প্রসংগে কোরআনের বাণী ঃ

"তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব (খেলাফাত) দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের জীবন বিধানকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা ইবাদাত করবে, আমার কোন শরীক করবেনা।" (নূর ঃ ৫৫)

এসব ছালেহীনরাই আল্লাহ পাকের সেই পুরষ্কারের যোগ্য হয়, যা 'আল্লাহ পাকের খেলাফাত' নামে অভিহিত। আর এ খিলাফাতের বিকাশস্থল দুনিয়া এবং আম্বিয়া ও রাসুলদের সত্যিকারের উত্তরাধিকারিত্ব। আল্লাহপাক ওয়াদা করেছেন, যে জাতি আম্বিয়া ও রাসুলদের উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করে সে জমীনের মীরাস লাভের অধিকারী হবে। দুনিয়ার কোন বাধা আল্লাহর এ ওয়াদা পূরনের পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে না। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন করবেনই। আমরা ইতিহাসের পাতায় ইবরাহীম (আঃ) ও নমরুদ, মুসা (আ) ও ফেরাউনের মধ্যকার লড়াইকে এ দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করতে পারি।

আমরা দাউদ (আ) ও সুলায়মান (আ) এর রাজত্ব ও নবুয়াত থেকে অন্য একটি বিষয়েও জানতে পারলাম আর তাহলো মানুষ যখন আল্লাহর পরিপূর্ণ

www.pathagar.com

অনুগত হয়ে যায় তখন পশু, পাখি, জ্বিন এমনকি বাতাসও তাদের অনুগত হয়ে যায়। আল্লাহতো সবই মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন।

দাউদ (আ) এবং সুলায়মান (আ) এর নবুয়াত এবং রাজত্বকালের অবসানের পর হতেই নানা দোষে দুষ্ট বনি ইসরাইলীদের পতন শুরু হয়। এ সময় তাদের ধর্মীয় ও চারিত্রিক অধঃপতন ঘটে। মিথ্যা, প্রতারণা, অবাধ্যতা, অত্যাচার ও কলহ তাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এরপরও মহান আল্লাহ তাদের হেদায়েতের জন্যে নবী প্রেরণ অব্যাহত রাখেন। আল্লাহ তায়ালা এ সময় উযায়ের (আ), যাকারিয়া (আ), ইয়াহিয়া (আ) সহ অনেক নবী প্রেরণ করেন। কিন্তু ইহুদীদের উপর তাদের উপদেশ নছীহতের কোন ক্রিয়া হলো না। তাদের অবাধ্যতা ও নাফরমানী বাড়তে লাগলো। তাদের ওলামা এবং ধর্মযাজকগণ স্বর্ণ ও রৌপ্যের মোহে মহান আল্লাহর আহকামের মধ্যে ধোঁকাবাজী শুরু করে দিল এবং হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল বানাবার কাজে নির্ভীক হয়ে গেল। তারা জনগণের ইলাহ বনে গেলো এবং জনগণ ও প্রকৃত ইলাহ আল্লাহর বিধানকে পিছনে ফেলে গোমরাহীম অনুসরণ করতে লাগলো। তারা আল্লাহর নবীদেরকে হত্যা করতে থাকলো। হযরত উযায়ের (আ) কে তারা খোদার পুত্র হিসেবে আখ্যায়িত করতে থাকলো যেমনটা পরবর্তীকালে খ্রিষ্টানরা করেছিল ঈসা (আ) এর ব্যাপারে। কোরআনের বাণীঃ "আর ইহুদীরা বলছে, উযায়ের আল্লাহর পুত্র। আর নাছারারা বলছে, মাসীহ (ঈসা) আল্লাহর পুত্র।" (তাওবাঃ ৩০)

ইহুদী জাতির প্রতি হাজারো অনুগ্রহের পরও তাদের এহেন অবাধ্যতা এবং খোদাদ্রোহীতা আল্লাহ পাকের ক্রোধের উদ্রেক করলো এবং তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতে চাইলেন। আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফল হিসেবে বাবেল রাজ অত্যাচারী বোখ্‌তা নাছার ইহুদী রাজত্ব ফিলিস্তিন ও শাম আক্রমন করলো এবং শহর গ্রাম ধ্বংস করে বাইতুল মুকাদ্দাসের দ্বারে উপনীত হলো। ইয়াহুদা রাজ্যের বাদশা বোখতা নাছারের আনুগত্য স্বীকার করলে সে সসৈন্যে জেরুজালেমে প্রবেশ করে। বোখতানাছার রাজ্যের বাদশাহ ওমারা এবং সকল নেতৃস্থানীয় লোকদের বন্দী করলো এবং শহরটিকে ধ্বংস করে দিল। সৈন্যগন সমস্ত ধনদৌলত এবং হাইকলের যাবতীয় বস্তু লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল। তাওরাতের সকল কপি জ্বালিয়ে দিলো এবং হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করলো। লক্ষাধিক লোককে ভেড়া বকরীর পালের ন্যায় তাড়িয়ে পদব্রজে বাবেল নিয়ে গেলো এবং তাদের সকলকে গোলাম ও দাসী বানিয়ে রাখলো। সত্তর বছর যাবত বাবেলে বন্দী জীবন কাটানোর পর পারস্য রাজের সহায়তায় আল্লাহ তাদের বন্দিদশা হতে মুক্তি দান করেন। কথায় আছে, 'কয়লার ময়লা যায় না ধুইলে, স্বভাব

www.pathagar.com

যায়না মইলে'। অতএব ইহুদী জাতি কুকুরের লেজের ন্যায়, পুনরায় বাঁকা পথে চলতে লাগলো। নবী পাঠিয়েও তাদেরকে সোজা রাস্তায় নিয়ে আসা গেলনা। তারা আভ্যন্তরীন কলহ কোন্দলে বিভক্ত হয়ে গেল এবং গৃহবিবাদ দেখা দিল। ইয়াহুদার রাজা গৃহযুদ্ধ বন্ধে রোমীয়দের সাহায্য গ্রহন করলো। এই সুযোগে রোমের ক্ষমতাসীন কায়জার ও তার সৈন্যরা জেরুজালেম দখল করে ইহুদীদের কচুকাটা করলো। তারা হাইকালের অবমাননা করলো। যেখানে এক আল্লাহর ইবাদাত করা হতো সেখানে বহু মূর্তি স্থান পেল। ইহুদীদের জন্য এটা এমন পরাজয় ছিল যে, তারা আর কোনদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি। মহাগ্রন্থ আলকোরআনের সুরা বনি ইসরাইলের শুরুতে ইহুদীদের উপর এই দুটি কঠোর আক্রমন ও শাস্তির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। কিছুদিন পর রোমীয়রা মূর্তিপূজা ছেড়ে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহন করেছিল এবং এভাবে তাদের উত্থান ও উন্নতি ইহুদী জাতীয়তা ও ধর্মকে পরাভূত ও পর্যুদস্ত করে দিলো।

হযরত ঈসা (আ) এর নবুয়াত ও খ্রিষ্টবাদের উত্থান ঃ

হযরত ঈসা (আ) যিনি খ্রিষ্টানদের নিকট খোদার পুত্র যীশুখ্রিষ্ট হিসেবে পরিচিত, তিনি ছিলেন আল্লাহর মনোনীত একজন মহান পয়গম্বর। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) হলেন সর্বশেষ নবী, আর ঈসা (আ) ছিলেন বনি ইসরাইলীদের শেষ নবী। পবিত্র কোরআনে মহানবীর (সা) ব্যক্তি সত্তার সংগে আর যেসব নবীর আলোচনা অধিক হারে স্থান পেয়েছে তারা হলেন- হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ) এর পবিত্র ব্যক্তি সত্ত্বা। ঈসা (আ) এর আবির্ভাব ঘটে মহানবী (সা) এর আবির্ভাবের ৫৭০ বৎসর পূর্বে জেরুজালেমে।

হযরত ঈসা (আ) মরিয়ম (আ) এর গর্ভে পিতা ছাড়া খোদার কুদরতে জন্মগ্রহন করেন। ইহুদীরা এ জন্য তাঁর চরিত্রে কলংক লেপন করতে কোনরুপ দ্বিধা বা লজ্জাবোধ করে নাই। তাঁর জন্ম ও যৌবনকালে তাদের অবস্থা গোমরাহীর শেষ প্রান্তে নেমে যায়। তারা আকীদা ও আমল উভয় ক্ষেত্রেই গোমরাহীর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গিয়েছিল। এমনকি নিজ জাতির হেদায়াতের কাজে নিয়োজিত নবীদের হত্যা করতে থাকলো। ইয়াহুদিয়ার বাদশাহ হিরোদাস তার প্রেমিকার তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে ঈসা (আ) এর সমসাময়িক নবী হযরত ইয়াহইয়া (আ)কে হত্যা করেছিল। কারণ তিনি তাকে অবৈধ যৌন সম্পর্ক ত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। আর এ ঘটনা ঈসা (আ) এর জীবিতকালে তার নবুয়াত লাভের পূর্বে ঘটেছিল।

ঈসা (আ) এর নবুয়াত সম্পর্কে মহান আল্লাহর ঘোষণা ঃ "অতপর তাদের পরে আমি আমার রাসুল প্রেরণ করেছি। এবং তাদের পরে ঈসা ইবনে

www.pathagar.com

মারইয়ামকে রাসুল নিযুক্ত করে প্রেরণ করেছি এবং তাকে ইঞ্জিল কিতাব দান করেছি"। (সুরা হাদীদ) এভাবে তিনি নবুয়াত প্রাপ্তির পর ইয়াহুদী জাতির উদ্দেশ্যে বলেন ঃ "হে বনী ইসরাইল, নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের পয়গম্বর, তাওরাতের সত্যায়নকারী যা আমার সামনে রয়েছে এবং সুসংবাদ দানকারী একজন রাসুলের -- যিনি আমার পরে আবির্ভূত হবেন, তার নাম আহমদ। অতপর যখন ঈসা আসলেন তাদের নিকট মোজেজা সমূহ নিয়ে, তখন তারা (বনী ইসরাইলরা) বলতে লাগলো, তা তো প্রকাশ্য জাদু।"

(সুরা আচ্ছাফ্‌ফাত)

"অতপর ঈসা (আ) তাদের মধ্য হতে কুফর অনুভব করলেন, তখন বললেন, 'আল্লাহ পাকের দিকে আমার সাহায্যকারী কে?' হাওয়ারীগণ বললেন, আমরা আল্লাহপাকের সাহায্যকারী, আমরা আল্লাহ পাকের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনি সাক্ষী থাকবেন যে, আমরা মুসলমান। হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি যা নাজিল করেছেন, আমরা এর উপর ঈমান এনেছি এবং আমরা রাসুলের অনুসরন করছি। অতএব আপনি আমাদেরকে (সত্যধর্মের) সাক্ষ্যদানকারীদের খাতায় নাম লিখে নিন।" (সুরা আল ইমরান)

নানা অপবাদ সত্ত্বেও ঈসা (আ) তাঁর দাওয়াত ও তালীম অব্যাহত রাখেন। দরিদ্র ও সাধারণ শ্রেণীর মানুষ তার আহবানে সাড়া দিতে লাগলো, আর এরাই ছিল তাঁর হাওয়ারী। দিনে দিনে তার হাওয়ারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলে ইহুদী নেতৃবৃন্দ ও ধর্মযাজকগণ তাদের শত্রুতার মাত্রা বৃদ্ধি করলো এবং যুগের বাদশাকে প্রভাবিত করে ঈসা (আ) কে শুলে চড়িয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র আটতে থাকলো। তারা যুগের বাদশা 'প্লাটিসকে' ভুল বুঝিয়ে ঈসা (আ) কে শুলে চড়িয়ে হত্যার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁকে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেন, যদিও পরবর্তী যুগের খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস আল্লাহর পুত্র 'যীশু' শূলীতে জীবন দিয়ে তাদের সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন। আমাদের বিশ্বাস অনুসারে জীবত ঈসা (আ) দুনিয়ায় আবার ফেরত আসবেন কিয়ামতের পূর্বে।

খ্রিষ্টান বিশ্বাস মতে ঈসা (আঃ) কে শূলীতে চড়িয়ে হত্যার পর হতে তার অনুসারী হাওয়ারীগণ নিজেদেরকে খ্রিষ্টান হিসেবে পরিচয় দান করে এবং ধর্ম প্রচার করতে থাকে। কালক্রমে ইহুদী সভ্যতার স্থান দখল করে খ্রিষ্টধর্ম। উভয় ধর্মের অনুসারীদের মধ্যকার যুদ্ধ-লড়াইয়ে ইহুদীরা বরাবর মার খেয়েছে। আধুনিক যুগে তাদের গণহত্যার জীবন্ত ইতিহাস হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে হিটলার কর্তৃক জার্মানীতে ৬০ লক্ষ ইহুদীর হত্যাকান্ড। এসবই তাদের লোভ, প্রতারণা, খোদাদ্রোহীতা ও মানবতার বিরুদ্ধে কৃত বহুমুখী অপরাধের ফলাফল।

www.pathagar.com

আজও তারা একই খেলা খেলে চলেছে, যদিও মুসলিম, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য জাতির দয়ার পাত্র হিসেবে দুনিয়ায় আশ্রিতের জীবন যাপন করছে।

বনি ইসরাইলের উত্থান-পতনের ধারায় নবীদের নেতৃত্বে বিশ্বময় সভ্যতার বিকাশের তাওহীদবাদী আধ্যাত্মিক ও নৈতিক তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। সভ্যতার এ ধারাটি আল্লাহর নবীদের নেতৃত্বে যাযাবরের ন্যায় **'হিজরত তত্ত্বের'** অনুসরণ করে দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানে তাদের উত্থান ঘটেছে সেখানে বস্তুবাদী সভ্যতার পতন ঘটেছে, আর যখন নবীর অনুসারীরা তাদের শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তখন-ই তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তাদের এ ধ্বংস কখনো কখনো আসমানী আজাব ও গজবের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে আবার কখনো কোন অত্যাচারী রাজা বাদশা কিংবা জাতির মাধ্যমে ঘটেছে। আর উত্থান-পতনের ধারায় নবুয়াতী সভ্যতা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর আগমন এবং মুসলিম সভ্যতার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের মধ্য দিয়ে আজও তা অব্যাহত আছে।

www.pathagar.com

ইসলামী সভ্যতার অভ্যুদয় ও কোরআন

নবুয়াতের ধারায় মহান আল্লাহ তায়ালার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মানব জাতি শেষবারের মত যে সভ্যতার সাথে পরিচিত হয়, তাহলো **'ইসলামী সভ্যতা'**। আরবের পবিত্র 'মক্কা, থেকে এই সভ্যতার যাত্রা শুরু হওয়ায় পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ এ সভ্যতাকে **'আরবীয় সভ্যতা'** নামেও অভিহিত করে থাকে। আর এ সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশ যার নেতৃত্ব ও পরিচালনায় ঘটে তিনি হলেন শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা), আর এ জন্য খ্রিষ্টান জগত এ সভ্যতার ধারক ও বাহক মুসলমানদেরকে তাদের ন্যায় **'মোহামেডান'** নামে অভিহিত করতো। অবশ্য ইসলাম তার অন্তর্নিহিত শক্তির বলে খ্রিষ্টান বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ায়, বর্তমানে তারা মুসলমানদেরকে মুসলমান বলতে বাধ্য হচ্ছে।

ইসলামের উত্থান ঃ

ইসলাম আল্লাহ মনোনীত সর্বশেষ জীবন বিধান (ধর্ম)। যুগে যুগে আল্লাহর প্রেরিত নবীগণ যে ধর্মের প্রচার করেন, এটি সেগুলির পূর্নাঙ্গ ও চূড়ান্ত সংস্করণ। এ প্রসংগে কোরআনের বাণী ঃ

"তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্যে ধর্মের সেই নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার আদেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন। আর যা (হে মুহাম্মদ) এখন তোমার প্রতি আমরা ওহীর সাহায্যে পাঠিয়েছি। আর যার হেদায়াত আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে দিয়েছিলাম এই তাকীদ সহকারে যে, কায়েম কর এই দ্বীন (ধর্ম)কে এবং ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেওনা।" (আশ-শূরা ঃ ১৩)

আর এসব নবীদের ধর্মের মূলকথা ছিল তাওহীদ বা একেশ্বরবাদ। তারা সকলে মানুষকে আহবান জানিয়েছেন এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের প্রতি।

সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্যায়ে যখন ইউরোপে খ্রিষ্টান ধর্ম প্রতিষ্ঠিত তখন সর্বশেষ বিশ্বধর্ম ইসলাম মানব জাতির সামনে উপস্থিত হয়। ইসলামের এই শাশ্বতবাণী ভেসে আসে আরবের এক ছোট শহর মক্কা থেকে। আর এ বাণীর বাহক ও প্রচারক হলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এ বাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে এবং তার আধ্যাত্মিক শক্তির জোরে প্রতিষ্ঠিত সকল ধর্ম ও সভ্যতার পতন ঘটিয়ে এক বিশ্বব্যাপক ইসলামী সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করে। এ সভ্যতা এমন এক সভ্যতা পৃথিবী তার আগে এ ধরনের কোন সভ্যতা প্রত্যক্ষ করেনি আর ভবিষ্যতে কখনো এ মানের সভ্যতা দেখতে চাইলে আল্লাহর মনোনীত চূড়ান্ত ধর্ম ইসলামের মাধ্যমেই দেখতে হবে। এই নতুন ধর্ম ইসলাম ও তার আলোকে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সভ্যতা সম্পর্কে জানার জন্য

www.pathagar.com

প্রয়োজন ইসলাম পূর্ব বিশ্ব বিশেষ করে আরব ভূমি এবং তার রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থান।

ইসলামের আবির্ভাবকালীন আরব ও বিশ্বব্যবস্থা ঃ

'মধ্যযুগের সভ্যতা' শীর্ষক আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, এ যুগ ছিল **'অন্ধকার যুগ'**। মধ্যযুগ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদদের এ মন্তব্যকে কোনভাবেই অস্বীকার করার সুযোগ নেই। বিশেষ করে ইসলামী সভ্যতার সুচনা পর্বটি বিশ্বজোড়া অন্ধকার যুগ ছিল। এ সময়টি ছিল আল্লাহর নবী হযরত ঈসা (আ) এর আবির্ভাবের প্রায় ৬০০ বছর পরবর্তী যুগ। বিশ্বমানব আল্লাহর প্রেরিত নবী রাসুলদের আদর্শ ও শিক্ষা ভুলে গিয়ে জড় পদার্থ, জীবজন্তু ও নিজেদের ন্যায় মানুষদের পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। কেউ মানুষকে খোদার অবতার সাব্যস্থ করেছে, আর কেউ খোদার পুত্র। একদল যদি জড় পদার্থের পুজারী হয়ে থাকে তবে অন্যদল নিজের আত্মাকে (রুহ)ই খোদা মনে করেছে। মানুষ চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। জীবজন্তু, বৃক্ষলতা এবং পাথর মানুষের পূজার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। আগুন, পানি, বায়ু ও মাটি সিজদার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। তখন বিশ্বের সমস্ত পদার্থই পূজা ও ইবাদতের যোগ্য বিবেচিত হতো। যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করতো তারাও অন্যদের পূজা করতো অর্থাৎ তাঁর অংশীদার তৈরী করতো তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। রাজনৈতিক ভাবেও গোটা বিশ্ব কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে শতধা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। অর্থনৈতিকভাবে সাধারণ জনগন ছিল দাস দাসীর স্তরে। এক কথায় শিরক, মূর্খতা এবং কুসংস্কারের ভয়াবহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল সমগ্র পৃথিবী।

গোটা দুনিয়া যখন এহেন ঘোর অন্ধকারে তমশাচ্ছন্ন, তখন বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (সা) আরবদেশের মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর জন্মের ৪০ বছর অতিক্রান্ত হলে আল্লাহতায়ালা তাঁকে নবুয়াত দিয়ে বিশ্বমানবের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দান করেন। তিনি যখন নবী হিসেবে তাঁর দাওয়াতী তৎপরতা শুরু করেন তখন আরবভূমি ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন মানচিত্র। আর এ কারণে তদানীন্তন আরবভূমিকে **'আইয়্যামে জাহেলিয়াত'** হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যাযাবর আরবরা নানা গোত্রে বিভক্ত ছিল। গোত্র প্রধানের নির্দেশ তারা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে চলতো। নিজের গোত্রের জন্যে তারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল। তাদের সমাজে কোন বিধিবদ্ধ আইন ছিল না। গোত্র প্রধানের হাতে যেকোন শাস্তি প্রদানের অধিকার ছিল। যাযাবর বেদুঈনরা নিজ হাতে আইন তুলে নিত। হাঙ্গামা বা যুদ্ধ বিবাদ লেগে গেলে তা বংশ পরম্পরায় চলতে

www.pathagar.com

থাকতো। এসব আরবদের মদ্যপান, জুয়খেলা ও সঙ্গীতের প্রতি তীব্র আকর্ষন ছিল। সর্বত্র 'বহু বিবাহ' প্রথা চালু ছিল। কোন কোন গোত্রে কন্যা সন্তানদের জন্মকে লজ্জাজনক মনে করা হতো, আর এজন্যে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী জন্মের পর কন্যা সন্তানকে হত্যা করা হতো অথবা জীবন্ত কবর দেয়া হতো। ফলে নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা ছিল বেশী। আর এ কারণে একজন নারীর একাধিক স্বামী গ্রহনের ব্যবস্থা ছিল যাকে বর্তমান সমাজের বেশ্যাবৃত্তির সংগে তুলনা করা যায়। এ সময় আরব দেশে দাসত্ব প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

সামাজিক ও রাজনৈতিক উপরোক্ত প্রেক্ষাপটের ন্যায় তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাও জাহেলিয়াতের ভারে ভারাক্রান্ত ছিল। মরুময় আরবে কৃষিদ্রব্য উৎপাদন সহজ ছিলনা। তাই বেদুইন আরবরা পশু পালন আর লুটতরাজের উপরই নির্ভরশীল ছিল। কোরআনের সুরা আল-আদিয়ায় তাদের লুটতরাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। সময়ের ব্যবধানে আরবের অর্থনীতিতে বাণিজ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করেছিল। হিজাজের তিনটি প্রসিদ্ধ নগরী মক্কা, মদিনা ও তায়েফ বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। ফলে মক্কায়, অনেক ধনী ব্যবসায়ীর সৃষ্টি হয়েছিল। সিরিয়া, পারস্য, বাইজেন্টাইন ইত্যাদি দেশের সংগে আরবদের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল।

ধর্মীয় প্রশ্নে তারা ছিল দেবদেবীর পূজারী। তারা গাছ, পাথর, গুহা, কুপ ইত্যাদিকে দেবতার শক্তি হিসেবে কল্পনা করতো, প্রত্যেক গোত্রের নিজস্ব উপাস্য দেবতা ছিল আর তাদের জন্যে ছিল সুনির্দিষ্ট আবাসস্থল। কাবা ঘরে ৩৬০টি দেবদেবীর মূর্তি ছিল। তিনজন দেবীকে সবচেয়ে বেশী সম্মান দেয়া হতো। এসব দেবী হলো আল্‌মানাত, আল্‌লাত এবং আল্‌উজ্জা, এযেন, আমাদের দেশের হিন্দু সমাজের দূর্গা, কালী ও স্বরস্বতী। দেবদেবীর পূজা উপাসনা প্রচলিত থাকার পাশাপাশি আরবে একেশ্বরবাদী ধারণা প্রচলিত ছিল। এক্ষেত্রে তারা বিশ্বাস করতো সমগ্র বিশ্ব নিয়ন্ত্রণকারী একজন ঈশ্বর আছেন। তিনিই পৃথিবীর স্রষ্টা। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ইহুদীবাদ ও খ্রিষ্টধর্ম ছিল একেশ্বরবাদী ধর্ম। এই দুই ধর্মের প্রভাবও পড়েছিল আরব সমাজ ও সংস্কৃতিতে। খ্রিষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতে বসতি স্থাপনকারী এসব ইহুদী গোত্রগুলো খুব ধনী ছিল। বাণিজ্যের উপর ইহুদীদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। কৃষি ও স্বর্ণ শিল্পে তাদের ছিল একচেটিয়া আধিপত্য। খ্রিষ্টান শিক্ষা এবং প্রথাও আরবদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কবিতা ও কাব্যের প্রতি আরবদের প্রবল আকর্ষণ ছিল। কবিতাই ছিল তদানিন্তন আরবদের ভাব প্রকাশের মাধ্যম। তাদের যাবতীয় ঘটনা বর্ণিত থাকতো কবিতায়। আরবের কবিরা ভাষা ও সাহিত্যের জন্যে গর্ববোধ করতো।

www.pathagar.com

আরবের এহেন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহন করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা), হযরত ইবরাহীম (আ) এর জেষ্ঠপুত্র হযরত ইসমাইল (আ) এর উত্তরসুরী বিখ্যাত কোরেশ বংশের লোক ছিলেন। তদানিন্তন জাহেলী সমাজে **'আল-আমিন'** খ্যাত মুহাম্মদ (সা) ৪০ বৎসর বয়সে নবুয়াত লাভ করেন। নবুয়াত প্রাপ্তির পর হতে নানা প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে হযরত মুহাম্মদ (সা) বিশ্বের দেশে দেশে মানবতার ধর্ম ইসলামের বাণী পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

ইসলামের জন্য আরব ভুমি বাছাইয়ের রহস্য ঃ

আরব দেশ প্রায় ১২ লক্ষ বর্গমাইলের একটি চতুর্ভুজাকৃতি উপদ্বীপ। এ ভুমির অধিকাংশ অঞ্চলই মরুময়। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা এ মরুময় উপদ্বীপকেই বেছে নিয়েছেন ওহী ও নবুয়াতের ধারাবাহিকতায় শেষ ধর্ম ইসলামের উন্মেষ ও বিকাশস্থল হিসেবে। আল্লাহর এ স্থান নির্বাচনের প্রকৃত রহস্য আল্লাহই ভাল জানেন। তারপরও আমাদের মানবীয় দৃষ্টিতে আমরা কতিপয় সম্ভাবনা খুঁজে পাই, আর সেগুলি হলো ঃ

১। আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ) তার প্রথম পুত্র ইসমাইল (আ) ও তার মা হাজেরা (আ) কে আরবের মক্কায় নির্বাসিত করেছিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহরই নির্দেশে পিতা ও পুত্র উভয়ে মিলে পৃথিবীর প্রথম মসজিদ **'কাবাঘর'** নির্মাণ করেন এই মক্কা নগরীতে। আর তখন থেকে একেশ্বরবাদী ধর্মের অনুসারীরা পৃথিবীর সকল দেশ ও স্থান থেকে কা'বা জিয়ারাতের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমণ করতো। এদিক থেকে প্রাচীনকাল হতেই মক্কা একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরী। দেশ দেশান্তর হতে এখানে আসা তীর্থযাত্রীদের ইসলামের দাওয়াত দেয়া সহজ ছিল।

২। ইসলাম ধর্মের প্রচারক ও প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন আল্লাহর নবী হযরত ইসমাইল (আ) এর বংশধর। ইবরাহীম (আ) তাঁর বংশে নবুয়াতের ধারাবাহিকতার জন্য আল্লাহর নিকট যে দোয়া করেছিলেন, মহান আল্লাহ তায়ালা সেই দোয়া কবুল করেন। ইবরাহীম (আ) এর পর নুবয়াতের ধারায় ওহী ভিত্তিক যে একত্ববাদী সভ্যতা পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল, হযরত ঈসা (আ) এর আগমনের মাধ্যমে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। নবুয়াতের ধারায় বিদ্যমান উক্ত বিশ্বসভ্যতাটি ছিল ইবরাহীম (আ) এর দ্বিতীয় পুত্র হযরত ইসহাক (আ) এর উত্তরসুরী। এদিক থেকে ইসমাইল (আ) এর বংশধর মুহাম্মদ (সা) এর মাধ্যমে বিশ্বসভ্যতায় ইসলামের বিকাশ ইবরাহীম (আ) এর দোয়ার পূর্ণতাজ্ঞাপক।

www.pathagar.com

৩। ইবরাহীম (আ) এর পরের গুরুত্বপূর্ণ সকল নবী মুহাম্মদ (সা) এর নুবয়াতের সুসংবাদ দান করেছেন। কিন্তু তাদের জাতির স্বভাব ছিল নবীদের বিরোধীতা এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। ইসরাইলী ধারার শেষ নবী ঈসা(আ) কে তারা ষড়যন্ত্র করে শুলে চড়িয়েছিল (তাদের দাবী)। তাদের আলেম ওলামা ও খ্রিষ্টান পাদ্রীরা জনগণের ইলাহ হয়ে বসেছিল। ইহুদীরা আল্লাহর নবী হযরত ঈসা (আ) কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্থ করে নিয়েছিল। তাছাড়া সংকীর্ণ দলাদলি উভয় সম্প্রদায়কে এতটাই হীনবল করে ফেলেছিল যে, তাদের পক্ষে সর্বশেষ খোদায়ী ধর্ম ইসলামকে ধারণ, প্রচার ও বিকাশের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা রাখাই সম্ভব ছিলনা। এ কারণে আল্লাহতায়ালা তাদের হাতে খোদায়ী বিধানের সর্বশেষ ঝান্ডা তুলে দেন নাই।

৪। কা'বাঘর পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। মুহাম্মদ (সা) এর মাধ্যমে নবুয়াতী ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তিনি যেহেতু বিশ্বনবী, তাই বিশ্বের কেন্দ্র বিন্দুতেই তাঁর জন্ম হওয়া যুক্তিযুক্ত।

৫। আরববাসী উন্নত ভাষা ও সাহিত্যের ধারক ছিল। তাদের সকল প্রকার ভাব-ভাবনা প্রকাশের মাধ্যম ছিল কবিতা। কোরআনের ন্যায় ঐশী গ্রন্থ যা অতি উন্নত মানের সাহিত্য তার সংরক্ষনের জন্যে আরবরাই ছিল সবচেয়ে মেধাবী ও যোগ্য জনগোষ্ঠী। এজন্য আল্লাহ মহানবী (সা) ও ইসলামের জন্য আরব ভূমিকে বাছাই করেন।

৬। আরবরা ছিল বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত যাযাবর জাতি। গোত্রের লোকেরা পরস্পরকে রক্ত সম্পর্কযুক্ত মনে করতো এবং একে অন্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল। গোত্র প্রধানের প্রতি তাদের আনুগত্য ছিল নিঃশর্ত। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের মতে বিভিন্ন রাজ্যের উত্থান-পতনের মূলে এই কৌম (গোত্র) চেতনা বিশেষভাবে কাজ করেছে। হযরত মুহাম্মদ (সা) এর নেতৃত্বে এই কৌমচেতনাই আরবদের জাতিগঠনে এবং ইসলাম প্রচারের কাজে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল।

৭। ভৌগলিক অবস্থানও ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য আরবকে বেছে নেয়ার অন্যতম কারণ হতে পারে। এই উপদ্বীপের বিভিন্ন সীমান্ত ঘিরে রয়েছে লোহিত সাগর, আরব সাগর, পারস্য উপসাগর এবং তাইগ্রীস-ইউফ্রেটিস উপ্যতাকা। ফলে সাগরপথে বিভিন্ন দেশে আরব বাণিজ্য তরী যাত্রা করতো। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আরবের দ্রব্যাদি বিক্রি করা হতো আর পূর্ব এশিয়া থেকে আনা মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী আরব বন্দরগুলোতে খালাস করা হতো। ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস পড়লে আমরা দেখতে পাবো যে, যোগাযোগগত সুবিধার কারণে ইন্দোনেশিয়া, মালোয়েশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড ইত্যাদি এলাকায়

www.pathagar.com

ইসলাম আরবের পার্শ্ববর্তী অনেক দেশের চেয়ে আগে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর আজো ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের সবচেয়ে বেশী মুসলিম অধ্যুসিত দেশ। এসব দেশে মূলত বাণিজ্য কাফেলার মাধ্যমেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল।

৮। আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে, ব্যবসা-বাণিজ্যই আরবদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন ছিল। তাই নৌ সুবিধার পাশাপাশি স্থলপথেও তদানিন্তন এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার অধিকাংশ দেশের সংগে আরব ও মক্কার নিবিড় যোগাযোগ ছিল। ব্যবসায় উপলক্ষে আরবরা সিরিয়া ও ফিলিস্তিন হয়ে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য, পারস্য সাম্রাজ্য সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করতো। ফলে এসব দেশের সাধারণ ও বিশেষ শ্রেণীর লোকদের সংগে তাদের যোগাযোগ ছিল। আবার দীর্ঘ বাণিজ্য পথের আশেপাশে অবস্থিত বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সংগেও তাদের পরিচয় ছিল। কা'বাঘর মক্কায় অবস্থিত হওয়ায় তারা এসব জাতির নিকট হতে বিশেষ মর্যাদা ও সুবিধা পেত। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এটিও সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

৯। এ প্রসংগে সর্বশেষ কথা হলো, হযরত ইসমাইল (আ) এর পর আরব এলাকায় আর কোন নবীর আগমন ঘটে নাই। অতএব এদেশটি সকল বিবেচনায় একজন নবীর আবির্ভাবের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হিসেবে গড়ে উঠেছিল। আর জাতি হিসেবে আরবদের অনেক দোষত্রুটি থাকলেও তাদের চরিত্রে অনেক মানবীয় গুণও বিদ্যমান ছিল। বালুকাময় মরুভূমিতে বসবাসের কারণে তারা ছিল দুর্ধর্ষ ও কষ্টসহিষ্ণু। তারা ছিল অনেকটা খনিতে থাকা সম্পদের মতো, যাকে ইচ্ছেমতো বিভিন্ন আকৃতি দেয়া সম্ভব ছিল। অতএব পৃথিবীর এ প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে চলার জন্য তাদের মত আর কোন জাতি পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল না। যোগাযোগ ও যাতায়াতের জন্য তদানিন্তন বিশ্বের সর্বাধুনিক যানবাহন ঘোড়া ও উট তাদের নিয়ন্ত্রনেই বেশী ছিল এবং কিভাবে সেগুলোকে কাজে লাগাতে হয় তারা তা জানতো।

হযরত মুহাম্মদ (সা) এর নবুয়াত ও ইসলাম প্রচার ঃ

চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়াত লাভের পর হযরত মুহাম্মদ (সা) ইসলাম ধর্মের প্রচার শুরু করেন। আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত ওহী আলকোরআনের বাণী প্রকাশের মাধ্যমে তিনি ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। ইসলামের মূল শিক্ষা তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের প্রতি তিনি আরববাসীদের আহবান জানান। মূর্তিপূজারী আরবদের নিকট হতে নানা বাধা প্রতিবন্ধকতা আসতে থাকে। তিনি সকল প্রতিকুলতা উপেক্ষা করে আল্লাহর নির্দেশে বিরামহীনভাবে দ্বীনের দাওয়াত অব্যাহত রাখেন। প্রথমদিকে সমাজের দরিদ্র ও দাস শ্রেণী এবং পর্যায়ক্রমে সম্ভ্রান্ত লোকেরাও তাঁর দাওয়াতে সাড়া

www.pathagar.com

দিতে লাগলো। চাচা আবু তালেবের পৃষ্টপোষকতায় তিনি দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়ায় আরবের অন্যান্য গোত্রের লোকেরা নবী (সা) ও তাঁর ছাহাবাদের আবু তালেবের গিরিগুহায় দীর্ঘকাল যাবত অবরুদ্ধ করে রাখে। কিন্তু তারা পরবর্তীকালে তাদের অবরোধ উঠিয়ে নিলে হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর দাওয়াত আরও জোরদার করেন। তাঁর অনুসারীর সংখ্যাও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এমন সময় ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াসরিববাসী তাঁকে তাদের দেশে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রন জানায়। এ সংবাদে নবীর (সা) বিরোধী পক্ষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। ইতিমধ্যে নবীর (সা) অধিকাংশ অনুসারী ইয়াসরিব গমন করেন। মক্কায় থেকে যান তিনি নিজে হযরত আবু বকর ও আলী (রা)। শত্রু পক্ষ তাঁকে হত্যার জন্য যে রাত্রি নির্ধারণ করে, সেই কালো রাতে আল্লাহর নির্দেশে হযরত আবু বকর (রা)-কে নিয়ে তিনি ইয়াসরিবের উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করেন। প্রিয় নবীর (সঃ) মদীনা যাত্রা ইতিহাসে **'হিজরত'** নামে পরিচিত। নবী (সা) এবং তাঁর অনুসারীদের ইয়াসরিববাসী উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং নবীর সম্মানে তারা শহরটির নাম পরিবর্তন করে রাখেন **'মদিনাতুন নবী'** বা নবীর শহর।

মদীনায় পৌছে হযরত মুহাম্মদ (সা) মদীনার ইহুদী, খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের নিয়ে একটি **Common Wealth** জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তিনি নিজে সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব গ্রহন করেন। মদীনায় থাকাকালীন ৮ বছর যাবত তাঁর দুশমন মক্কাবাসীদের সংগে যুদ্ধে অতিবাহিত করেন। এ সময় ইহুদী ও আরবের অনেক গোত্র তাঁর বিরুদ্ধাচরন করেছিল। তিনি বদর, ওহুদ, খন্দক ইত্যাদি যুদ্ধের মাধ্যমে শত্রুপক্ষের মোকাবেলা করেন এবং ৮ম হিজরী সনে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে আরবদের বিরোধীতার অবসান ঘটে।

হিজরী ৮ম ও ৯ম সাল ইসলামের ইতিহাসে **'প্রতিনিধি প্রেরণের বৎসর'** হিসেবে পরিচিত। এ সময় আরবের বিভিন্ন এলাকা ও পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহে তিনি ইসলামের দাওয়াত প্রদান করে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে লোকেরা মদীনায় এসে তাঁর আনুগত্যের স্বীকৃতি প্রদান করে। এসব এলাকাবাসীর মধ্যে খ্রিষ্টান জনপদও ছিল। মক্কা বিজয়ের পর কা'বার মূর্তিগুলো ভেংগে ফেলা হয়।

আরবে হযরত মুহাম্মদ (সা) এর ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্য দশম হিজরীর মধ্যে মোটামুটি সাফল্য অর্জন করে। তিনি ২৫শে যিলক্বদ হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করেন। এখানে হজ্জ অনুষ্ঠানের পূর্বে ১০ জিলহজ্জ তিনি আরাফাত পর্বতের চুড়ায় আরোহন করে সমবেত মুসলমানদের

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে মূল্যবান ভাষণ রাখেন। একই দিন মহানবী (সা) বিদায়ী ভাষণ দেন। বিদায় হজ্জ শেষে মক্কা হতে মদীনায় পৌছলে ১১ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে তিনি ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

খোলাফায়ে রাশেদুন ঃ

ইসলামের ইতিহাসে হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রা) এর শাসনকাল ইসলামী সংস্কৃতি ও মুসলমানদের রাজ্য বিস্তারের জন্য বিশেষভাবে প্রসিদ্ধিলাভ করে। তারা ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা) এর যোগ্য উত্তরাধিকারী। তাদেরকে খোলাফায়ে রাশেদুন নামে অভিহিত করা হয়।

এসব খলিফা সাধারণ মানুষের ন্যায় সরল জীবন যাপন করতেন। তারা রাজতন্ত্রের রাজা কিংবা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদেরকে দেবতা জ্ঞান করে মানুষের আনুগত্য ও অধীনতা দাবী করেন নাই। তারা নিজেদেরকে মানুষের সেবক হিসেবে প্রমাণ করেছেন। ফলে ইসলামের মহান আদর্শ ও খলিফাদের সৎ ও সাদা- মাটা জীবন যাপন প্রণালী প্রত্যক্ষ করে দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহন করে। ফলে অতিদ্রুত গতিতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে।

হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জীবদ্দশায় ইসলাম গোটা আরবের ধর্মে পরিণত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর (রা) খলিফা নির্বাচিত হলে শিশু ইসলামী রাষ্ট্র নানা প্রকার বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। একজন দক্ষ ও সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে হযরত আবু বকর (রা) এসব বিদ্রোহ যুদ্ধাভিযানের মাধ্যমে মোকাবেলা করে ইসলামী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। বহিঃশত্রুর আক্রমনের হাত থেকে রক্ষা পায় ইসলামী রাষ্ট্র। গোত্র শাসনের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মদীনা হতে পরিচালিত খলিফার শাসন আরব গোত্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে। এভাবে খলিফা আবু বকর (রা) বিশ্বজয়ের পূর্বে আরববাসীদের হৃদয় জয় করে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী ইসলামী খিলাফত কায়েম করেন।

দু'বছরের সংক্ষিপ্ত শাসনকাল অতিবাহিত করে হযরত আবু বকর (রা) ইন্তেকাল করলে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমার মদিনার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী হযরত ওমর (রা) ন্যায়পরায়নতা, দক্ষ প্রশাসক ও বিজেতা হিসেবে হযরত আবু বকরের (রা) যোগ্য উত্তরসুরী ছিলেন। তার খিলাফতকালে পারস্য, সিরিয়া ও মিশর মুসলমানদের অধিকারে আসে।

হযরত ওমর (রা) এর ইন্তেকালের পর ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে হজরত উসমান (রা) ইসলামী জগতের তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। কিন্তু হযরত আলীর সমর্থকরা এই নির্বাচনে সন্তুষ্ট হতে পারে নাই। হজরত উসমানের গোত্র ছিল

www.pathagar.com

উমাইয়া আর হযরত আলীর গোত্র ছিল হাশেমী। এই উভয় গোত্রের মাঝে মত বিরোধ ছিল, খলিফা নির্বাচনের সূত্র ধরে উক্ত বিরোধ অধিকতর গভীর হয়। তাই নানা কারণে হযরত উসমানের (রা) শাসনকালে ইসলামী রাষ্ট্রের ভৌগলিক বিস্তৃতি তেমন না হলেও রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রভূত উৎকর্ষতা সাধিত হয়। তার শাসনকালের শেষের দিকে বিভিন্ন কারণে বিদ্রোহ দেখা দিলে নম্র ও ভদ্র স্বভাবের অধিকারী হযরত উসমান (রা) ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ জুন বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন।

বিদ্রোহীদের হাতে হযরত উসমানের (রা) নিহত হওয়ার পর মদিনায় তীব্র অরাজকতা দেখা দেয়। ফলে ইসলামী খিলাফত ভয়ংকর বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। এই সংকটময় মূহুর্তে পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা ও মদিনার বিশিষ্ট ছাহাবীদের অনুরোধে হযরত আলী (রা) ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুন ইসলামের চতুর্থ খলিফার দায়িত্ব গ্রহন করেন। তাঁর খিলাফত ছিল ক্ষণস্থায়ী। শাসনকালের অধিকাংশ সময় জুড়েই তাকে নানা গোলযোগের মোকাবেলা করতে হয়। এ সময় উমাইয়া ও হাশেমী গোত্রের মধ্যে দ্বন্দ চরম আকার ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারী বিদ্রোহীদের আঘাতে আহত হযরত আলী (রা) শাহাদাত বরণ করেন।

আভ্যন্তরীন বিদ্রোহ ও যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য হযরত আলীর (রা) শাসনকালে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা খুব বেশী বিস্তার ঘটে নাই। সিস্তান ও কাবুলে রাজ্য বিস্তার ঘটে। তার মৃত্যুর পর খারিজি নামক ধর্মীয় গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে এবং পরবর্তীতে তার স্মৃতিকে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে শিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে খোলাফায়ে রাশেদার যুগের অবসান ঘটে এবং ইসলামী খিলাফাত চলে যায় উমাইয়াদের হাতে।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে মুসলিম শাসন বিস্তার ঃ

হযরত মুয়াবিয়া ৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ায় উমাইয়া শাসন কায়েম করেন। তাদের শাসনকাল ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এ যুগেও ইসলামের বিস্তার অব্যাহত থাকে। খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর থেকেই হযরত মুয়াবিয়া ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতির দিকে মনোযোগ দান করেন। প্রথমে তিনি ইতিপূর্বে অধিকৃত গজনি, কাবুল, কান্দাহার ও পারস্যের বিদ্রোহ দমন করেন। ৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম বাহিনী সিন্ধুনদ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। ৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে মুয়াবিয়ার শাসনকালে মুসলিম সৈন্যরা রোমানদের পরাজিত করে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা দখল করে সেখানে ইসলাম প্রচারের উদ্যোগ গ্রহন করে। এখানে বারবারগন ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন। এ সময় মুয়াবিয়া নৌবাহিনী গঠন করে সিসিলি ও রোডস জয়

www.pathagar.com

করেছিলেন। তার শাসনামলের পর খলিফা প্রথম ওয়ালিদের সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে উমাইয়া যুগে এশিয়া মাইনর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, পারস্য, মধ্য এশিয়া এবং ভারতবর্ষের একাংশ পর্যন্ত ইসলাম বিস্তৃত হয়।

উমাইয়া বংশের পতনের পর ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসীয় বংশ খিলাফত দখল করে। উমাইয়া আমলে দামেস্ক ছিল ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী। আব্বাসীয় আমলে রাজধানী স্থাপন করা হয় বাগদাদে। আব্বাসীয় আমলেও ইসলামের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকে এবং ইসলামী সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত বিকাশ সাধিত হয়। আব্বাসীয় সাম্রাজ্য আটলান্টিক মহাসাগর থেকে সিন্ধু নদ এবং কাস্পিয়ান সাগর থেকে নীলনদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগের পরেও ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তার অব্যাহত থাকে এবং পর্যায়ক্রমে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, চীনের নানা অঞ্চল হয়ে গোটা দক্ষিণ এশিয়া এবং সমগ্র আফ্রিকায় ইসলামী সভ্যতার বিস্তার ঘটে। এসব দেশে ইসলাম অদ্যাবধি তার শিকড় গেড়ে আছে এবং সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের সর্বত্র তা ছড়িয়ে পড়ছে।

বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিস্তৃতির পিছনে যুদ্ধের একটি ভূমিকা থাকলেও মূলত এর আধ্যাত্মিক শক্তি এবং বাস্তবমুখী জীবন দর্শন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রেখেছে। কেননা যুদ্ধের মাধ্যমে কোন দেশের মাটি জয় করা যায় কিন্তু মানুষকে জয় করা যায় না। ইসলাম মাটি ও মানুষ দুটোকেই জয় করেছে। বাংলা-পাক-ভারতীয় উপমহাদেশ এর জীবন্ত উদাহরণ। পক্ষান্তরে ইংরেজরা ১৯০ বছর ভারতবর্ষ শাসন করেছে কিন্তু তাদের ধর্মের কোন প্রভাবই এখানে গড়ে উঠেনি। এক সময় তাদের সাম্রাজ্যে সুর্যাস্ত যেতনা আর এখন তা তিনটি দ্বীপ রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

কোরআন ও ইসলামী সভ্যতা ঃ

ইসলামী সভ্যতার অপর নাম **কোরআনী সভ্যতা**। মহাগ্রন্থ আলকোরআন এই সভ্যতার প্রাণ ও চালিকা শক্তি। মূলত আল্লাহ তায়ালার পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁরই অবতীর্ণ আলকোরআনের আদর্শ ও নির্দেশনা অনুসারে শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সা) এ সভ্যতার সুচনা করেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় তা সমগ্র আরববাসীর ধর্ম ও সভ্যতায় রুপ পরিগ্রহ করে। খোলাফায়ে রাশেদার নেতৃত্বে এ সভ্যতা তদানিন্তন বিশ্বের অধিকাংশ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং একটি স্থায়ী সভ্যতার রুপ লাভ করে। উমাইয়া এবং আব্বাসীয় খলিফাগন ইসলামী সভ্যতাকে এতটাই বিস্তৃতি দান করেন যে, তার মোকাবেলায় এককভাবে কখনো কোনো বিশ্বশক্তি মাথাতুলে দাঁড়াতে পারেনি।

www.pathagar.com

ইসলামী সভ্যতার উত্থান ও বিস্তৃতি আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটেছে। মহান আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা বাস্তাবয়ন করেছেন তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর নেতৃত্ব, আলকোরআনের আদর্শ ও শিক্ষার ভিত্তিতে। মহানবীর (সা) নবুয়াতের এক পর্যায়ে হাজার হাজার বছরব্যাপী খোদায়ী ধর্মের উত্তরাধিকারী বনি ইসরাইলকে সে দায়িত্ব ও মর্যাদা হতে অপসারিত করে উম্মতে মোহাম্মাদী তথা মুসলিম জাতিকে বিশ্ব নেতৃত্বের উক্ত মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। আর তাও করা হয় আলকোরআনের নাজিলকৃত খোদায়ী নির্দেশনার মাধ্যমে। তাই ইসলামী সভ্যতার বিস্তারে কোরআনের অবদান সম্পর্কে কোরআন থেকে কিছু উদ্বৃতি তুলে ধরছি। আল কোরআনের বাণী ঃ

"রোজার মাস হচ্ছে এমন একটি মাস যাতে কোরআন নাজিল করা হয়েছে। আর এই কোরআন হচ্ছে মানব জাতির জন্যে পথের দিশা - সুস্পষ্ট প্রমাণ সম্বলিত জীবন বিধান এবং হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী মানদন্ড।"

(আল বাকারাঃ ১৮৫)

"তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রাসুলকে একটি স্পষ্ট পথ নির্দেশ (কোরআন) ও সত্য ধর্ম ইসলাম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন সে (রাসুল) এই ব্যবস্থাকে দুনিয়ার প্রচলিত সব কয়টি ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করে দিতে পারেন-তা মোশরেকদের কাছে যতোই অপছন্দনীয় ব্যাপার হোক না কেন।" (আস সাফ ঃ ৯)

"(হে মোহাম্মদ!) আমি তোমাকে সমগ্র বিশ্বের মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরন করেছি।" (সাবা ঃ ২৮)

এ আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট ভাবে প্রমানিত হচ্ছে যে, মহান আল্লাহ কোরআন ও ইসলামকে প্রেরণ করেছেন সকল যুগের সকল দেশের সকল মানুষের হেদায়াত ও মুক্তির উদ্দেশ্যে। মুহাম্মদ (সা) কে তিনি নবী ও রাসুল হিসেবে মনোনীত করেছেন বিশ্ব মানবতার জন্যে। নবী (সা) নিজেও বলেছেনঃ "(আমার পূর্বে বিশ্বের) অন্যান্য নবীগণ তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিল। কিন্তু একমাত্র আমিই বিশ্বের সকল মানব জাতির উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি"। আর স্বয়ং নবীর (সা) নেতৃত্বেই বিশ্বের সকল ধর্ম ও মতবাদের উপর ইসলামের বিজয়ী হওয়ার নিশ্চয়তা দান করেছেন।

আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি যে, মহানবী (সা) এর জীবদ্দশাতেই সমগ্র আরবে ইসলাম অন্য সকল ধর্ম ও মতবাদের উপর বিজয় অর্জন করেছে এবং মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবীর (সা) ইন্তেকালের পর আলকোরআনে তার পূর্ব ঘোষনা মোতাবেক মুসলিম উম্মাতকে বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করেছেন। এ প্রসংগে কোরআনের বাণী ঃ

www.pathagar.com

"এবং এভাবেই আমি তোমাদের এক উৎকৃষ্ট অথচ মধ্যমপন্থী মানব দলে পরিণত করেছি যেন তোমরা দুনিয়ার অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছে আমার হেদায়াতের সাক্ষীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারো। একইভাবে নবী রাসুলগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের ব্যাপারেও তোমাদের জন্য এক একজন সাক্ষী হিসেবে পরিগণিত হতে পারেন।" (আল বাকারা ঃ ১৪৩)

"তোমরাই এই দুনিয়ায় সর্বোত্তম জাতি। সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। (শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে) তোমরা দুনিয়ার মানুষদের সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে, সর্বোপরি নিজেরাও তোমরা আল্লাহর ওপর পুরোপুরি ঈমান পোষণ করবে।" (আল ইমরান ঃ ১১০)

অতএব দেখা যায়, আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে বিশ্বময় ইসলামী সভ্যতার উত্থান ঘটেছে। মুসলমানগণ বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হয়েছে। অবশ্য এ মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার জন্যে তাদেরকে যথার্থ ঈমানদার হতে হয়েছে এবং বিশ্বের বুক থেকে সকল প্রকার অন্যায় - অবিচার এবং শোষণ-নিপীড়নের উৎখাতের পক্ষে জীবন মরণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। আর এ সংগ্রাম ও কোরবানী ঈমানের অপরিহার্য দাবী। এ প্রসংগে কোরআনের বানী ঃ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের কাছ থেকে জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জীবন ও সম্পদ খরিদ করে নিয়েছেন। এরা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, অতপর (এই জিহাদে কখনো কাফেরদের) তারা হত্যা করে (কখনো আবার শত্রুর হাতে) নিজেরা নিহত হয়। এই খাঁটি ওয়াদা এর আগেও তাওরাতে ও ইনজীলে করা হয়েছিল আর এখন তা করা হয়েছে এই কোরআনে। এই ওয়াদা পালন করা আল্লাহ তায়ালার নিজস্ব দায়িত্ব আর আল্লাহর চাইতে কে অধিক ওয়াদা পূরণ করতে পারে? অতএব তোমরা তাঁর সাথে যে কেনাবেচার কাজটি করলে তাতে আনন্দ প্রকাশ করো এবং এটিই হচ্ছে এক মহা সাফল্য।"(তাওবা ঃ১১১)

"তোমাদের একি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সে সব অসহায় নরনারী ও শিশুদের (বাঁচাবার জন্যে লড়াই করবে না -- যারা নির্যাতনে কাতর হয়ে) ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের প্রভু আমাদের এই জালেম জনপদ থেকে কোনো দেশে বের করে নাও, অতপর তুমি আমাদের জন্যে তোমার কাছ থেকে কোনো অভিভাবক পাঠিয়ে দাও, তোমার কাছ থেকে কোনো জনদরদী (শাসক) পাঠিয়ে দাও।"(আন নেসা ঃ ৭৫)

www.pathagar.com

সুতরাং মুসলিম জাতির উত্থানে ঈমানের দাবী পূরণ ও মজলুমদের ফরিয়াদ বিশেষ প্রেরণা হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। মুসলিম জাতি কোন জাগতিক স্বার্থচিন্তা বা প্রতিষ্ঠার মোহে নয় বরং জান্নাতের আশায় মজলুম মানবতার মুক্তির চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে বিশ্বের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্ধকার যুগে মানুষ তাদের মাঝে জ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সত্য, ন্যায় - ইনসাফ ও মানবতার আলো দেখে তাদেরকে নিজ নিজ দেশে স্বাগত জানিয়েছে, স্বদেশের জালেমদের মোকাবেলায় মুসলিম বিজেতাদের সর্বোতভাবে সহযোগিতা দান করেছে। ফলে বিশ্বময় স্থায়ী ইসলামী সভ্যতা গড়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

মুসলমানদের পতন

মহান আল্লাহ তায়ালা মুসলিম জাতিকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং পৃথিবীর দেশে দেশে তাদেরকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বহুমুখী প্রতিষ্ঠা দান করেছেন। স্পেন থেকে শুরু করে ইন্দোনেশিয়া এবং আফ্রিকা থেকে শুরু করে চীন ও রাশিয়ার প্রান্ত দেশ হয়ে ইউরোপের বসনিয়া-হারজেগোভিনিয়া পর্যন্ত ইসলামী খেলাফত সম্প্রসারিত হয়। মুসলিম শাসন ও ইসলামের আধ্যাত্মিক শক্তিতে পৃথিবীর এ বিশাল এলাকা জুড়ে ইসলাম ধর্ম ও সভ্যতা হিসাবে একটি স্থায়ী রুপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু সভ্যতার উত্থান পতনের ধারায় গোটা মুসলিম বিশ্ব এক সময় ব্রিটিশদের নেতৃত্বে পাশ্চাত্য সভ্যতার উত্থানের ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে গোলামীর নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের হাত হতে মুসলিম বিশ্ব রাজনৈতিকভাবে স্বাধীনতা লাভ করলেও অদ্যাবধি জীবনের সকল ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণা এবং মতবাদ মতাদর্শই আমাদের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের শাসক সম্প্রদায়ের ও জনগণের চিন্তা-ভাবনা দুই ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। সাধারণ জনগণ সোনালী যুগের ন্যায় জীবন যাপনের ক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণে ইচ্ছুক। কিন্তু ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব ও সুবিধাভোগী গোষ্ঠী নিজেদের ক্ষমতার স্বার্থে পাশ্চাত্যের অনুসরণ করছে এবং কোথাও কোথাও পাশ্চাত্যের স্বার্থ রক্ষার্থে আপন জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লড়াইয়ে লিপ্ত রয়েছে। অবশ্য ইসলামপ্রিয় জনতা মুখবুঝে সকল জুলুম ও নিপীড়ন সহ্য করতে প্রস্তুত নয়, তাদের নিকট জীবনের চেয়েও ধর্ম অনেক বড়। তারা জেগে উঠছে, প্রতিবাদ করছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ইতিবাচক ফলও লাভ করছে। সভ্যতার পালা বদলের পালায় ক্ষয়িষ্ণু পাশ্চাত্য সভ্যতার পতন অনিবার্য হওয়ায় পৃথিবীর ভবিষ্যত নেতৃত্ব গ্রহনের জন্য ইসলাম ছাড়া অন্য কোন সভ্যতার ইতিবাচক আয়োজন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং বস্তুবাদের আদর্শে পরিচালিত অন্যান্য জাতি গোষ্ঠী আগ্রাসন ও দমন পীড়নের মাধ্যমে বিশ্বসভায় নিজ নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। পক্ষান্তরে ইসলাম বিশ্ব জোড়া অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে, আর আল্লাহর ইচ্ছাতেই তা ঘটছে। অতএব মুসলিম মিল্লাতের পূণর্জাগরণের প্রস্তুতি মুহূর্তে তাদের পতনের কারণ সমূহ খতিয়ে দেখা একান্ত জরুরী।

মুসলিম জাতির উত্থান ও ইসলামী সভ্যতার বিকাশের পূর্বে বনিইসরাইল (ইহুদী ও খ্রিষ্টান) ছিল ঐশি ধর্মের ধারক ও বাহক। বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা ও খোদাদ্রোহীতামূলক আচরণের ফলে মহান আল্লাহ তাদেরকে

www.pathagar.com

পদচ্যুত করেন এবং তাদের স্থলাভিষিক্ত করেন মুসলিম উম্মাতকে। এ প্রসংগে কোরআনের বাণী ঃ "তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব (খিলাফত) দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। (সুরা নূর ঃ ৫৫)

অতএব দেখা যায় যে, মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে শুধুমাত্র তাদের যোগ্যতা, প্রতিভা কিংবা প্রচেষ্টার কারণে পৃথিবীতে নেতৃত্ব ও কতৃত্ব দান করেন নাই বরং আল্লাহর প্রতি তাদের দৃঢ় ইমান এবং সে অনুসারে তাদের বাস্তব জীবন গড়ে তোলার পুরস্কার হিসেবে তাদের উক্ত মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। আর যাদেরকে এ মর্যাদা দান করেছেন তাদরেকে কিছু দায়িত্ব কর্তব্যও প্রদান করেছেন। এ প্রসংগে কোরআনের বাণী ঃ "ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার গুরু দায়িত্ব এমন লোকদের উপর ন্যস্ত করতে হবে যাদেরকে পৃথিবীর প্রতিপত্তি ও রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রদান করলে সেখানে তারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত আদায়ের সুব্যবস্থা করবে। আর জনগণকে সহজ সরল পথে পরিচালনার জন্যে ন্যায় ও সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায় ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে।"

(সুরা হজ্জ ঃ ৪১)

কোরআনের এ আয়াতের আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকদের প্রধান দায়িত্ব হলো নামাজ ভিত্তিক সমাজ ও যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করা। অর্থাৎ শ্রেণী বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকবে না আর অনাহারে কোনো মানুষ মারা যাবে না। সমাজের সকল প্রকার অন্যায়, অশ্লীলতা, অবিচার দূর করে সুবিচার কয়েম করা। যাতে প্রতিটি নাগরিক শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে সে ব্যবস্থা করা। এক কথায় দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন'ই হবে এ সরকারের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। মুসলিম খলিফাগন যতদিন এ দায়িত্ব পালন করেছেন ততোদিন দুনিয়াজোড়া ইসলামী সমাজ ও সভ্যতা বিজয়ীর আসনে সমাসিন ছিল। আর যখনই তারা খোদা নির্ধারিত এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবজ্ঞা ও অবহেলা শুরু করলো তখনই তাদের পতনযুগ শুরু হলো। অর্থাৎ আদর্শচ্যুতির কারণে ইসলামী সভ্যতার বিপর্যয় নেমে আসে এবং তার পতন হতে থাকে। ইসলামী সভ্যতার পতনের অপর গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো মুসলমানদের অনৈক্য। মহান আল্লাহ কোরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ "তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে আকড়ে ধরো এবং কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো ন।" (আল ইমরান ঃ ১০৩)

ইসলামী সভ্যতার উত্থান ও বিকাশের অন্যতম উপাদান ছিল মুসলিম জাতির ঐক্য ও সংহতি এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তারা ছিল একটি দেহের বিভিন্ন

www.pathagar.com

অংশের সমন্বিত রুপ এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিল সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়। বর্ণ, গোত্র ও ভাষা নির্বিশেষে একে অন্যের ভাইয়ে পরিণত হয়েছিল। আর সম্পর্কের ভিত্তি ছিল আল্লাহর ভালোবাসা, পার্থিব কোনো স্বার্থ নয়। যতদিন মুসলমানদের এ ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য বিদ্যামান ছিল ততোদিন তারা ছিল বিশ্ববিজয়ী। কিন্তু যখন তারা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে বিচ্যুত হয়ে নানা জাতি ও গোত্রে বিভক্ত হয়ে গেল তখন তাদের অবস্থা হলো পাল হতে বিচ্ছিন্ন ভেড়ার মতো। শুধুমাত্র অমুসলিমদের দ্বারাই তারা আক্রান্ত হলো না উপরন্ত ক্ষমতা ও স্বার্থের মোহে একে অন্যের মস্তুপাত করতে থাকলো, তারা ভ্রাতৃহত্যায় লিপ্ত হলো। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে ইসলামী সভ্যতার পতন অবধারিত হয়ে পড়লো। এক পর্যায়ে ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের-কলোনীতে পরিণত হয়ে যায়। বাংলা পাক ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের পরাধীনতা শুরু হয় ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজদৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এবং তা ষোলকলায় পূর্ণ হয় ১৮৫৭ সালের ব্যর্থ সিপাহী বিদ্রোহের করুন পরিণামের মধ্য দিয়ে। ফলে ১৯০ বছর যাবত উপমহাদেশের মুসলমানদের ব্রিটিশের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকতে হয়েছিল।

ইসলামী সভ্যতার পতনের ক্ষেত্রে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল আর তাহলো ইউরোপে নবজাগরণের ফলে জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাহিত্য সংস্কৃতির আধুনিক সভ্যতায় যে গতি সঞ্চারিত হয়েছিল মুসলমানদের পক্ষে তার মোকাবেলা করার মতো শক্তি ছিল না। এক কালের জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত সুসভ্য মুসলিম জাতি আধুনিক সভ্যতার জোয়ারে ভেসে যেতে লাগলো। তাদের প্রাচীন ধ্যান ধারণা দিয়ে অন্যের মোকাবেলা তো দুরে থাকুক নিজেদের আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব তারা ধরে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছিল। একদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানো, অন্যদিকে আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মোকাবেলায় ব্যর্থ জাতি দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লো। একদল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শক্তির অনুগত হয়ে পড়লো এবং নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করলো। পক্ষান্তরে অন্য একটি দল নিজেদেরকে সকল প্রকার আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে বঞ্চিত রেখে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকায় সীমবদ্ধ করে ফেললো। অন্যের দান দক্ষিণার উপর ভিত্তি করে নিজেদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে থাকলো। একদল পার্থিব ভোগ বিলাসে আত্মনিয়োগ করলো আর অন্যদল দুনিয়াকে প্রত্যাখান করতে গিয়ে সমাজের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। ফলে রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি এমনকি ধর্মীয় ক্ষেত্রেও দুনিয়া পূজারীদের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। আর এভাবেই ইসলামী সভ্যতার পতন ষোলকলায় পূর্ণ হলো।

দীর্ঘ সংগ্রামের পর বিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধাংশে মুসলিম বিশ্ব ভৌগলিক স্বাধীনতা লাভ করলেও পাশ্চাত্যের মানসিক গোলামী থেকে মুক্তি

www.pathagar.com

পেলোনা আর এরই পরিণতিতে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব রাজনৈতিকভাবে রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। মুসলমান হয়েও বিশ্বজোড়া তাদেরকে পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্রসহ নানা প্রকার পাশ্চাত্য মতবাদ দ্বারা শাসিত ও শোষিত হতে হচ্ছে। কোন প্রকার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে গেলেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি নানা অজুহাত সৃষ্টি করে উদীয়মান শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করছে।

ইসলামী সভ্যতার এই পতন বা বিপর্যয়কে ইসলামের পতন হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। আমরা একে মুসলমানদের পতন ও বিপর্যয় বলতে পারি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, মুসলমানদের আদর্শচ্যুতি, তাদের অনৈক্য ও দ্বন্দ-সংগ্রাম এবং আধুনিক সভ্যতার মোকাবেলায় নিজেদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও জ্ঞানগত দূর্বলতা এ পতনকে তরান্বিত করেছে।

মুসলমানদের অধিকাংশ দেশে আধুনিক সভ্যতার ধারকগণ তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মামুলী বাধার সম্মুখীন হয়েছে বরং প্রতিদ্বন্দী গোষ্ঠীগুলোর সহায়তায় তাদের এ বিজয়াভিযান সহজ হয়েছে। কিন্তু দেশের আলিম সমাজ এসব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। অবশ্য প্রতিরোধ যুদ্ধে বিভিন্ন দেশে বিপুল সংখ্যক আলেম প্রতিপক্ষ শক্তির হাতে শাহাদাত বরণ করেছেন, আমাদের উপমহাদেশের আজাদী সংগ্রাম এ ত্যাগের জুলন্ত উদাহরণ। সম্মুখ সমরে ব্যর্থ হয়ে আলেম সমাজ তাদের কর্মকৌশল পরিবর্তন করে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকার চার দেয়ালে সীমাবদ্ধ হয়ে যাওয়ায় ইসলামী সভ্যতার স্থলে পাশ্চাত্য সভ্যতা পুরোপুরি জেঁকে বসে। আর মুসলমানরা নেমে যায় শাসকের আসন থেকে শাসিতের স্তরে। ফলে সাম্রাজ্যবাদী শাসকের শিক্ষা-সংস্কৃতি, আইন-বিচার, রাজনীতি-অর্থনীতি মুসলিম জনগণকে মুখ বন্ধ করে সহ্য করতে হয়। দীর্ঘদিন পাশ্চাত্য সভ্যতার অধীনে জীবন যাপন করার ফলে তারা পাশ্চাত্য জীবন ধারায় অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে, ফলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেও আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক গোলামী অব্যাহত থাকে। আজ দেশে দেশে উল্টো মুসলমানরাই ইসলামের আদর্শিক বিরোধীতায় লিপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই চলছে। এমনকি এ দ্বন্দ একই পরিবারের সদস্যদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়েছে। আর এখানেই পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতার সাফল্য। মানব সভ্যতার ইতিহাসে শয়তান যেভাবে মানুষের বিরোধীতায় মানুষকেই তার প্রধান সহযোগী হিসেবে পেয়েছে অনুরুপভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারকরাও মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে তাদের মানস সন্তানদের তাদের সহযোগীর ভূমিকায় দেখতে পাচ্ছে। আর মুসলমানদের ব্যর্থতা এখানেই।

www.pathagar.com

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ

পাশ্চাত্য সভ্যতার উত্থান ও বিজয়ে মুসলমানদের পতন ঘটেনি। ইসলাম তার আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে পরাজিত মুসলমানদের পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্মুখীন হতে এবং নব্য বস্তুবাদী খোদাহীন সভ্যতার মুখোমুখি দাঁড়াতে প্রাণ সঞ্চারকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারক বাহকদের সংগে মুসলমানদের পরাজয়কালীন রাজনৈতিক দ্বন্দ-সংঘাত পর্যায়ক্রমে আদর্শিক সংগ্রামের রুপ পরিগ্রহ করেছে। উভয় সভ্যতার এ সংগ্রাম অব্যাহত আছে এবং ইসলামী সভ্যতার বিজয় না হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। ক্ষয়িষ্ণু-ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতা ইসলাম বিরোধী সকল জাতি গোষ্ঠীকে অস্তিত্বের লড়াইয়ে একই মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষে এ লড়াইয়ের নাম দিয়েছে সভ্যতার দ্বন্দ **(Clash of civilization)**। পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বঘোষিত এ 'সভ্যতার দ্বন্দের' প্রেক্ষাপটে আমাদেরকে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যকার দ্বন্দের স্বরুপ উপলব্ধি করতে হবে যাতে মুসলমানরা তাদের পূণর্জাগরণের পথে সঠিক কর্মপন্থা গ্রহন করতে পারেন।

ইসলাম আল্লাহ মনোনীত বিশ্বধর্ম। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এ ধর্ম আধ্যাতিকতা ও বাস্তববাদিতার সমন্বয়ে রচিত হয়েছে। এ ধর্মের সারকথা হলো তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ, রেসালাত বা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর নেতৃত্ব এবং আখেরাত বা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের শাস্তি ও পুরষ্কারে বিশ্বাস। ওহীর ধারাবাহিকতায় এ ধর্ম শেষ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন, এ ধর্মের ধর্মগ্রন্থ আল-কোরআন হলো সর্বশেষ ও পুর্ণাঙ্গ আসমানী কিতাব এবং এ ধর্মের প্রচারক, উপস্থাপক, প্রতিষ্ঠাতা এবং মডেল হলেন নবীদের নেতা জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ শেষ নবী মানবতার বন্ধু ও মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (সা)। এ ধর্মের বিধিবিধান ও আইন কানুনের প্রধান উৎস হলো মহাগ্রন্থ আলকোরআন আর তাতে সংরক্ষিত রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির সকল সমস্যার সমাধান। মুসলিম জাতি হচ্ছে উক্ত কোরআনের ধারক ও বাহক। আর এ জাতি সাধারণ অর্থে কোনো জাতি নয় বরং তারা হচ্ছে ইবরাহীম (আ) এর আধ্যাত্মিক ও বংশধারার চূড়ান্ত বিকশিত রূপ। এসব কিছুর বিবেচনায় মুসলমানগণ সভ্যতার উত্থান পতনের ধারায় রাজ্য হারা হয়েও ধর্মহীন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রক্ষমতা সহায়ক শক্তি, সবকিছু নয়। আর এ কারণেই মহানবী (সা) মক্কা হতে মদীনায় হিজরতের সময় যে দোয়া করেছিলেন তাহলো, '(হে মোহাম্মাদ) বল আমার প্রভু আমাকে প্রবেশ

www.pathagar.com

করাও সত্য সহকারে যথাযথ প্রবেশ, আমাকে বের কর যথাযথ বাহির সত্যসহকারে এবং আমাকে সাহায্য করো রাষ্ট্র ক্ষমতা দিয়ে।' অতএব রাষ্ট্র ক্ষমতা হারানোর ফলে তৎকালীন মুসলমানদের পতন ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আর তাতে ইসলামও মুসলমানদের সভ্যতা সংস্কৃতি সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তাদের সামনে সুযোগ এসেছে নিজেদের অবস্থা শুধরে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার।

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা--এ সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে খ্রিষ্টান পোপ পাদ্রী ও সামন্ত প্রভুদের বর্বর শাসন, শোষন ও নির্যাতন থেকে মুক্তির আকাংখায় মধ্যযুগের জাহেলী ইউরোপের উদর থেকে। মধ্যযুগের ইউরোপে ধর্মের নামে অধর্ম চালু ছিল। পোপ ও সামন্ত প্রভুরা জনগনের খোদার আসনে আসীন ছিল। যেকোন নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান, তত্ব ও তথ্য তাদের কাছে কুফরীর নামান্তর ছিল। গ্যালীলীওসহ আধুনিক সভ্যতার জনকদের পোপ পাদ্রীরা নাস্তিক আখ্যা দিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল। তাই ধর্ম ও ঈশ্বরের অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্ম ও যাত্রা শুরু হয়। ফলে এ সভ্যতার আদর্শিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে বস্তুবাদ ও নাস্তিকতা। এ সভ্যতার তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিতে এ জগতের কোন স্রষ্টা ও নিয়ন্তা নেই। আমাদের পৃথিবী দূর্ঘটনার ফল। এখানে জীবনের উৎপত্তি বস্তুর বিবর্তনের ফলাফল। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ বিবর্তিত এক কোষী প্রাণীর উত্তর পুরুষ বানরের উন্নততর সংস্করণ। অতএব মৃত্যুর পরবর্তী জীবন, শাস্তি -পুরস্কার এবং জান্নাত-জাহান্নাম বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। মৃত্যুই মানব জীবনের চুড়ান্ত পরিসমাপ্তি। তাদের পার্থিব কাজ কর্মের জন্যে কারো নিকট জবাবদিহি করতে হবে না। অতএব তাদের দর্শন হলো--- "eat, drink and be merry" অর্থাৎ খাও দাও ফুর্তি করো। আর এ দর্শন স্বাভাবিকভাবেই মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। ফলে নৈতিকতা ও মানবতা বিবর্জিত রাজনীতি, সমাজনীতি ও সাংস্কৃতিক অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। রাজনীতিবিদরা একনায়ক ও সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকায় অবতীর্ন হলে সমাজে দেখা দিলো নানা রকম বৈষম্য এবং অর্থনীতিতে জন্ম নিলো সুদভিত্তিক পূঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা। আর চারিত্রিক প্রশ্নে মানুষ আর পশুতে কোনোই তফাৎ লক্ষ্য করা গেলোনা। পুঁজিবাদের শোষণের ফলে দেখা দিলো সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজমের নামে একদলীয় ডিকটেটরশীপ। এভাবে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও উদারনৈতিক গণতন্ত্রসহ নানাধরণের মতবাদের সৃষ্টি হলো। গোটা বিশ্ব এক জাহেলিয়াতের হাত থেকে মুক্তির অভিপ্রায়ে নতুন জাহেলিয়াতের জালে জড়িয়ে পড়েছে। আর এভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা নিজেদের তৈরী জালে আটকা পড়ে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত।

www.pathagar.com

আমরা উপরের আলোচনায় ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শিক পার্থক্য প্রত্যক্ষ করেছি। আদর্শিক দিক থেকেই উভয় সভ্যতার অবস্থান সাংঘর্ষিক। ইসলামী সভ্যতা ওহী ভিত্তিক একটি ধর্মীয় ব্যবস্থা আর এর মূলকথা হলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে নেয়া এবং তাঁর নির্দেশনা অনুসারে মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ, সংস্কৃতি, আইন, বিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলকথা হলো নাস্তিকতা ও বস্তুবাদ। এক্ষেত্রে বস্তুই সর্বশক্তিমান। এ সভ্যতার চালিকাশক্তি হলো মানুষের আন্দাজ-অনুমান এবং তাদের পাশবিক চাওয়া ও পাওয়া। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পার্থিব সুখ সমৃদ্ধি এবং তাদের বৈষয়িক উন্নতিই এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ন্যায়-অন্যায়, সংগত-অসংগত যেকোন পন্থা ও কাজই জায়েজ। এ সভ্যতার ধারক ও বাহকরা নিজের স্বার্থ ও সুবিধার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় আইন কানুন রচনা করে থাকে কিংবা জনগণের সার্বভৌমত্বের নামে। ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংগে ইসলামী সভ্যতার দ্বন্দ এ সভ্যতার মুসলিম বিশ্বে প্রবেশের সংগে সংগেই শুরু হয়ে যায়। ইসলামের বিজয় যুগে অন্যান্য সভ্যতার সংগে ইসলামী সভ্যতার দ্বন্দ সংঘাত আর এ সংঘাতের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ইসলাম তার বিজয় যুগে মধ্যযুগনামীয় অন্ধকার যুগের রোমক, পারসিক, ভারতীয় ও চৈনিক সভ্যতার সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিল। সে সময় ইসলাম ছিল ড্রাইভারের আসনে আর তার অধীনস্থ এসব সভ্যতা ছিল প্যাচেঞ্জারের পর্যায়ভুক্ত। তখন মুসলমানদের মাঝে জিহাদ ও ইজতিহাদের ভাবধারা তীব্রভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। আধ্যাত্মিক ও বস্তুতান্ত্রিক উভয়দিক থেকেই তারা দুনিয়ায় এক বিজয়ী জাতির গৌরব অর্জন করেছিল এবং অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর নেতৃত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিল। সে সময়কার পৃথিবীতে এমন কোন সভ্যতা সংস্কৃতি ছিল না যা মুসলমানদের মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারে। তারা যেদিকে এবং যে জাতির কাছে পৌঁছেছে তার চিন্তা, চেতনা, ধ্যান-ধারণা, মতবাদ-মতাদর্শ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, স্বভাব-চরিত্র ও সমাজ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। আবার অন্যদের কাছ থেকে গ্রহন করার মতো কিছু থাকলে তা গ্রহন করতেও দ্বিধা করেনি। কোনো কোনো সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে ইসলামী সভ্যতার মাঝে মিলে মিশে একাকার হয়েছে। প্রায় দেড় হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও মুসলিম রাষ্ট্র নামে পৃথিবীর অর্ধ শতেরও অধিক দেশ এ অবস্থার জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার উত্থানকালে মুসলমানদের মাঝে বিরাজ করছিল এক সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। যে কোরআন তাদেরকে জ্ঞানের আলোও কর্মের

www.pathagar.com

শক্তি সরবরাহ করেছিল তাকে তারা মহাপবিত্র জ্ঞানে গেলাফবন্দী করে রেখেছে। যে মহা মানবের জীবনাদর্শ তাদেরকে বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে আসীন করেছিল তারা তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ ছেড়ে দিয়েছিল। আর এর ফল যা হবার তাই হলো। এক প্রবাহমান স্রোতস্বিনী হঠাৎ নিশ্চল উপত্যকায় গতিরুদ্ধ হয়ে ক্ষুদ্র সরোবরের রুপ পরিগ্রহ করলো। তাদের চিন্তাধারায় জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির উপর যে আধিপত্য বিস্তার করেছিল তার বাঁধন শিথিল হয়ে গেলো। পক্ষান্তরে উদীয়মান পাশ্চাত্য সভ্যতা মুসলমানদের পরিত্যাক্ত জিহাদ ও ইজতিহাদের পতাকা নিজেদের হাতে তুলে নিলো। মুসলমানরা আরাম আয়েশের সুখ নিদ্রায় শায়িত থাকলো আর পাশ্চাত্য জাতিগুলি জ্ঞান ও কর্মের ময়দানে দ্রুত অগ্রগতি সাধন করলো। তাদের বন্দুক দুনিয়ার বেশীর ভাগ এলাকা জয় করে নিলো।

তাদের ধ্যান ধারণা, মতাদর্শ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প ও সংস্কৃতি এবং সভ্যতার মূলনীতি গোটা পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলেছে। কেবলমাত্র মানুষের দেহের উপরই তাদের কতৃর্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি, মানুষের মন মগজও তাদের দখলে চলে গেল। অবশেষে মুসলমানদের ঘুম ভাঙ্গলো। কয়েক শতাব্দীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠে চোখ মেলে তারা দেখতে পেল যে, গোটা ময়দানই তাদের হাতছাড়া এবং তা দখল করেছে অন্য লোকেরা। এখন জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি-সভ্যতা, আইন-বিধান ও রাষ্ট্রক্ষমতা বলতে যা কিছু বুঝায় সবই তাদের - মুসলমানরা নিজেদের দেশে পরবাসী।

শুরু হলো ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ। এ দ্বন্দ সংঘাত শুরু হলো নতুন আঙ্গিকে নতুন ধারায়। এ কথা দিবালোকের মত সত্য যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা কোন বিচারেই ইসলামী সভ্যতার মোকাবেলা করতে সামর্থ্য রাখেনা। অধিকন্তু ইসলামের সংগে সংঘর্ষ বাধলে অন্য কোন শক্তির পক্ষেই তার মোকাবেলায় টিকে থাকা সম্ভব হবে না। কেননা ইসলামের আবির্ভাবই বিজয়ের জন্যে আর তাই ইসলামের প্রকৃতিতেই বিজয়ের শক্তি নিহিত। কিন্তু ইসলাম কোথায়? আদর্শ বেঁচে থাকে, বিজয়ী হয় তার অনুসারীদের চরিত্র ও কর্মের উপর ভিত্তি করে। মুসলমানদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া ইসলাম অনুপস্থিত। তাদের কথা কাজে মিলের চেয়ে অমিল বেশী। আর সবই ইসলামের সংগে সংগতিহীন। এমতাবস্থায় চলমান দ্বন্দ সংঘাতকে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ না বলে একে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ একটি গতিশীল সভ্যতার সংগে মুসলমানদের জরাজীর্ণ, অনগ্রসর ও নিশ্চল সভ্যতার দ্বন্দ হিসেবে অভিহিত করা যায়। এ দ্বন্দ সংঘাতে মুসলমানরা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়েছিল। তাদের ধ্যানধারণা, চিন্তাধারা, নীতি-নৈতিকতা,

www.pathagar.com

সমাজ-সামাজিকতা, অর্থনীতি, রাজনীতি সবই পাশ্চাত্যের রঙে রঙিন হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থার মোকাবেলায় যাদের এগিয়ে আসার কথা ছিল তারা একে সাদর সংবর্ধনা জানালো আর আলেম সমাজ যারা ইসলামের মূল প্রতিনিধি (সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া) তখন ইসলামের প্রকৃত প্রাণচেতনা থেকে যোজন যোজন দুরে সরে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে না ছিল ইজতেহাদী শক্তি না চিন্তা গবেষণার ক্ষমতা। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং কর্মক্ষমতাও লোপ পেয়েছিল। তাদের মধ্যে পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরনের রোগ পুরামাত্রায় সংক্রমিত হয়ে পড়েছিল। ফলে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত অবস্থায় মুসলমানদের সাফল্যজনক নেতৃত্ব দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এতদসত্বেও আলেম সমাজ নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির মোকাবেলা করার জন্যে যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু মোকাবেলার প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত হাতিয়ার তাদের মালিকানায় ছিলনা। তাদের জানা উচিৎ ছিল যে, স্থবিরতা দিয়ে গতিশীলতার মোকাবেলা করা যায় না। যেমন তরবারী দিয়ে বন্দুক কামানের মোকাবেলা অসম্ভব। অতএব যুক্তিতর্কের প্রাচীন পদ্ধতি কিংবা বয়কট জাতীয় কর্মসূচী দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার জোয়ারের মোকাবেলা সম্ভব ছিলনা আর সাফল্য সেতো সুদুর পরাহত। ফলে রাজনৈতিক পরাজয়ের পাশাপাশি সংস্কৃতি ও সভ্যতাগত পরাজয়ও পূর্ণতা লাভ করলো।

সভ্যতার উত্থান পতনে **'প্রতিকুলতা তত্ব'** অনুসারে কোনো জাতি গোষ্ঠীকে শক্তি প্রয়োগে দীর্ঘকাল দাবিয়ে রাখা যায় না। পরাধীনতা, দমন-পীড়নে তাদের মধ্যকার সুপ্ত স্বাজাত্যবোধ অপ্রতিরোধ্য গতিতে জেগে উঠে। কোনো বাধা প্রতিবন্ধকতা তার মোকাবেলা করতে সক্ষম হয় না। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মুসলমানদের ক্ষেত্রে সেটাই ঘটেছিল। দেশে দেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদসহ সকল ইউরোপীয় আগ্রাসী শক্তিকে তাদের সাম্রাজ্যবাদী হাত গুটিয়ে নিতে হয়েছিল, আর একে একে মুসলিম দেশগুলো উপনিবেশিক শাসন হতে মুক্তি লাভ করে। যদিও এসব স্বাধীনতা আন্দোলন ইসলামের নামে পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর সেগুলো জাতি রাষ্ট্রের রুপ পরিগ্রহ করে। আলেম সমাজ মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকায় প্রত্যাবর্তন করে আর পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সংস্কৃতিতে সংস্কৃতবান সেক্যুলার ব্যক্তিরা রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। কোথাও কায়েম হয় রাজতন্ত্র, আর কোথায়ও ক্ষমতা দখল করে সামরিক ও বেসামরিক একনায়কগণ এবং অনেক দেশে ক্ষমতার মসনদ দখল করে বামপন্থী একদলীয় শাসকগণ। ভৌগলিক স্বাধিনতা অর্জিত হলেও সভ্যতা ও সংস্কৃতিগত পরাধীনতা থেকেই গেল। বিদেশী শাসক ও শোষকদের স্থান দখল করলো দেশী শাসক ও শোষকেরা। ফলে সভ্যতার দ্বন্দ নতুন রুপ পরিগ্রহ করলো।

www.pathagar.com

গোটা বিশ্ব আমেরিকার নেতৃত্বে পুঁজিবাদী এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়লো। মুসলিম বিশ্বও এ বিভক্তির হাত থেকে রক্ষা পায়নি। এসব দেশের শাসকগোষ্ঠী তাদের পছন্দ মতো দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দুই পরাশক্তির অধীনতা গ্রহন করলো। বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যকার স্নায়ু-যুদ্ধকালীন সময়কালে মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে কতিপয় আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদের নেতৃত্বে ইসলামী পূণর্জাগরণ আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনে দলে দলে আধুনিক শিক্ষিত তরুন প্রজন্ম ব্যাপকহারে অংশ গ্রহন করতে থাকলো। মাদ্রাসা শিক্ষিতদের একটি অংশও এগিয়ে আসলো। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী তাদের ক্ষমতার প্রতিবন্ধক মনে করে তাদের উপর ভয়াবহ দমন পীড়ন শুরু করলো। তাদের অনেকে স্বদেশ ত্যাগ করে ইউরোপ আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছে এবং সেসব দেশের মুক্ত পরিবেশে সংঘবদ্ধ হয়ে তারা ইসলামের প্রচারে আত্মনিয়োগ করলো। তাদের এ উদ্যোগ ইতিবাচক ফল দিলো। ব্যাপক হারে খ্রিষ্টান ও ইহুদীরা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহন করতে শুরু করলো। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতায় এক ধরণের অস্থিরতা শুরু হয়েছে। ইসলামের অগ্রাভিযান তাদেরকে উদ্বিগ্ন ও ভীত করে তুলেছে। এ সময়ের মধ্যে সোভিয়েত ফেডারেশন হতে রাশিয়া ব্যতীত অন্যান্য দেশ ও জাতি বেরিয়ে পড়লে আমেরিকার নেতৃত্বে এক কেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। ফলে সভ্যতার দ্বন্দ নতুন গতি ও প্রকৃতি লাভ করে।

ইহুদীদের নেতৃত্বে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ নতুন এ মেরুকরণকে **'সভ্যতার দ্বন্দ'** নাম দিয়ে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের বিরুদ্ধে **'ক্রুসেড'** ঘোষণা করে। এ ক্রুসেডে গোটা অমুসলিম বিশ্বকে আমেরিকার নেতৃত্বে ইসলামী পূণর্জাগরণ প্রতিহত করার লক্ষে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ গৃহীত হয়। বিশ্বব্যাপী অনেক ইসলামী সংগঠনকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধের ঘোষনা দেয়া হয়। বিভিন্ন সংগঠনের পাশাপাশি আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমন করে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকাও তার সহশক্তিবর্গ দেশ দুটি দখল করে নেয়। লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করে। মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোকে এ যুদ্ধে তাদের সহযোদ্ধা হতে অথবা সমর্থন করতে আহবান জানানো হয়। অধিকাংশ রাষ্ট্রের শাসকগণ তাদের আহবানে সরব কিংবা নীরব সম্মতি প্রদান করে। সাধারন জনগন আমেরিকা বিরোধী অবস্থান গ্রহন করে। বর্তমানে আমেরিকার নেতৃত্বে পাশ্চাত্য সভ্যতা যার নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা ইসরাইল ও ইহুদীদের হাতে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের নামে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের মুখোমুখি অবস্থান গ্রহন করেছে। মুসলমানদের মধ্যকার কিছু ব্যক্তি ও সংগঠন তাদের পাতানো জালে জড়িয়ে জিহাদের নামে সন্ত্রাসীর ভুমিকায় অবতীর্ন হয়েছে। এসব ব্যক্তি ইহুদী ও

www.pathagar.com

আমেরিকার অর্থে প্রতিপালিত এবং নিজেদের কাজের মাধ্যমে তাদেরকে মুসলিম বিশ্বে হামলার সুযোগ করে দিচ্ছে। এসব ব্যক্তি ও দল কোনো ভাবেই ইসলাম ও মুসলমানদের বন্ধু বা সহায়ক হতে পারে না আর তাদের জঙ্গী কাজকেও ইসলাম সমর্থন করে না। এভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শিক ভিত্তি যত দুর্বল হচ্ছে তারা নানা কৌশলে ততো বেশী ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে আর এভাবে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করছে। মুসলিম বিশ্ব শান্তির অন্বেষণে সংলাপের উদ্যোগ নিলেও পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বন্দের নামে মুসলমানদের সংগে নানাভাবে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছে। ফলে সভ্যতার দ্বন্দ চুড়ান্ত রুপ নেয়ার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে পড়েছে। পুনরুত্থানকামী ইসলামী শক্তিকে এসব উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রেখে পথ চলতে হবে এবং সকল প্রকার দ্বন্দ সংঘাত এড়িয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, উন্নততর প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার এবং নিজেদের কর্ম ও আচরণের মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানের মাধ্যমে সভ্যতার নতুন সংঘাতের মোকাবেলা করতে হবে। মনে রাখতে হবে অস্ত্র ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করা যায় তাদের মন জয় করা সম্ভব নয়। সভ্যতা ধ্বংস করা যায় কিন্তু সভ্যতা সৃষ্টি করা কঠিন। ইসলামের আভ্যন্তরীন শক্তি এত বেশী জোরালো যে, কোন ব্যক্তি মুক্ত মন নিয়ে কোরআন অধ্যয়ন করলে, ইসলাম সম্পর্কে চিন্তা করলে তার পক্ষে ইসলাম গ্রহন না করে কোন উপায় থাকে না। বিশ্বজোড়া বর্তমানে তাই ঘটছে।

এক্ষেত্রে যাদের অগ্রণী ভূমিকা রাখা দরকার তারা হলো **'উম্মতের আলেম সমাজ'**। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য হাতে গোনা কিছু ব্যক্তি ছাড়া আলেম সমাজের বিপুল অংশ এখনো হাজার বছর পুরানো ধ্যান ধারণা লালন করে চলছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে তারা বহু দুরে অবস্থান করছেন। ইজাতিহাদ বা নতুন জ্ঞান গবেষণা তাদের অনেকের কাছে এখনো নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফলের ন্যায়। নানা প্রকার আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার তাদের নিকট অবৈধ। যুগ সমস্যার সমাধান দিতে তারা অপারগ। এক্ষেত্রে অগ্রসর হতেও তাদের অনীহা। নিজেদেরকে হক্কানী আলেম দাবী করে অধিকাংশই নিজেদেরকে ইমামতী, মুয়াজ্জেনী, মিলাদ, ওয়াজ ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত রেখেছেন। আর নিজেদের জীবন জীবিকা নির্বাহের প্রশ্নে অন্যদের দান অনুদানের উপর নির্ভর করছেন। এ অবস্থা ও মনোভাব সত্যিই পীড়াদায়ক। নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন ও ইসলামের বিজয়ের জন্য তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে অন্যথায় অধীনতা ও লাঞ্চনাই ভাগ্য লিপি হয়ে থাকবে। এ প্রসংগে কোরআনের ঘোষণা ঃ 'মহান আল্লাহ কোন জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটান না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য অগ্রসর হয়।'

www.pathagar.com

মানব জাতির ভবিষ্যত ও ইসলাম

সভ্যতার উত্থান পতনের ধারায় বিশ্বের সকল দেশে আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ সভ্যতার জন্ম মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপের গর্ভে। খ্রিষ্টান ধর্ম ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও লড়াইয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট এ সভ্যতা শুরু থেকেই ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং ধর্মকে প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রহন করে। আধুনিক সভ্যতা তার উত্থান পর্বে ধর্মের সংগে কিছুটা আপোষমূলক অবস্থান গ্রহন করেছিল। কিন্তু পর্যায়ক্রমে তা ধর্মবিরোধী কঠোর অবস্থান গ্রহন করতে থাকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ডারইউনের বিবর্তনবাদের প্রকাশ ও প্রচারের মধ্য দিয়ে এ সভ্যতা ধর্মকে শত্রু জ্ঞানে প্রত্যাখ্যান করে এবং নাস্তিকতাকে মূল জীবন দর্শন হিসেবে গ্রহন করে। ১৯১৭ সালে খোদাহীন বস্তুবাদের প্রতিনিধিত্বকারী পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে রাশিয়ায় সম্পূর্ণ নাস্তিক্যবাদী একদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীকালে রাশিয়ার প্রভাবে চীন ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহসহ পৃথিবীর অনেক দেশে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আমেরিকা মহাদেশেও এ আদর্শের প্রভাব পড়ে। মধ্য এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সমূহ, ভারতীয় উপমহাদেশসহ আফ্রিকার অনেক দেশ সমাজবাদ ও রাশিয়াকর্তৃক প্রভাবিত হয়। কোনো কোনো দেশে রাশিয়ার সমর্থক সরকার প্রতিষ্ঠা পায় আবার অনেক দেশে তাদের সমর্থক রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী গড়ে উঠে। সর্বত্র একটি সাইমুম বয়ে যেতে থাকে। রাশিয়া অনেকটা অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ে। ফলে পুঁজিবাদের স্বর্গ আমেরিকা এবং কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার নেতৃত্বে পৃথিবী দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দুই পরাশক্তির মাঝে আধিপত্যের লড়াই শুরু হয়। সমগ্র বিশ্ব তাদের সামরিক ও আদর্শিক লড়াইয়ের উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই দুই পরস্পর বিরোধী সুপার পাওয়ারের উত্থান ও বিকাশের এক পর্যায়ে তদানিন্তন বিশ্বশক্তির হাত থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহ স্বাধীনতা লাভ করে। এসব স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তৃতীয় বিশ্ব নামক অনেকগুলি রাষ্ট্র জোটনিরপেক্ষ নামক একটি বিশ্ব সংগঠন গড়ে তোলে। এটি ছিল মূলত দন্তহীন ব্যাঘ্র। এ অবস্থায় এশিয়ার পূর্বপ্রান্তে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জনসংখ্যা নিয়ে কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থার আওতায় চীন নিজেকে সংগঠিত করতে থাকে।

সমাজতন্ত্র নিজস্ব কোনো সভ্যতা সৃষ্টি করতে পারেনি। এটি একটি অর্থনৈতিক মতাদর্শ। মূলত পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়ারই ফসল হলো সমাজতন্ত্র বা

www.pathagar.com

কম্যুনিজম। উভয়ের উত্থান ঘটেছে ইউরোপ থেকে। দুটো সভ্যতাই বস্তুবাদী সভ্যতা। শিল্পোন্নত ইউরোপে মালিক শ্রমিক দ্বন্দের ফলশ্রুতিতে সর্বহারার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার শ্লোগানের এক পর্যায়ে মার্কস ও এঙ্গেলসের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় কম্যুনিষ্ট বিপ্লব ও একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উত্থান লগ্নে সমাজতন্ত্র একটি অনুকুল পরিবেশে ইউরোপসহ গোটা দুনিয়ার শ্রমিকদেরও সমর্থন লাভ করে। এছাড়া পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্ছার কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ ও সমাজকর্মী সহ সর্বস্তরের স্বাধীনতাকামীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সমর্থন লাভে এ আন্দোলন সাফল্য লাভ করে। কিন্তু এ আন্দোলন যতটা ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে আবার ততোধিক তীব্র গতিহীনতায় মাত্র ৭০ বছরের মাথায় রাশিয়ান ফেডারেশন ভেংগে যাওয়ার মধ্য দিয়ে পতনযুগে প্রত্যাবর্তন করে।

সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজমের প্রবক্তারা একটি শ্রেণীহীন সমাজ কায়েমের লক্ষে দেশে দেশে বিপ্লবের মাধ্যমে ধনী-দরিদ্র, কৃষক-শ্রমিক নির্বিশেষে সকল মানুষকে একই পাল্লায় মাফতে গিয়ে ভুল করে, আর এখানেই কম্যুনিষ্টদের মৃত্যু ঘন্টা নিহিত ছিল। তারা সম্পদের উপর ব্যক্তির পরিবর্তে রাষ্ট্রের নামে দলীয় মালিকানা কায়েম করে। মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে এবং মানুষকে এক প্রকার পশু হিসেবে বিবেচনা করতে থাকে। তারা মানুষের দেহকে বিবেচনায় রেখে তাদের আত্বিক ও আধ্যাত্বিক চাহিদাকে অস্বীকার করে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহ তাদের দেশে ধর্মপালন নিষিদ্ধ ঘোষনা করে। কালক্রমে কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে বসলে নতুন শোষক ও শাসক শ্রেণীর জন্ম নেয় ফলে তা পুঁজিবাদের রুপ লাভ করে। দীর্ঘদিন দাবিয়ে রাখার ফলে মানুষের আত্বিক চাহিদা বেড়ে যায় এবং ধর্মীয় চেতনার পূনর্জাগরন ঘটে। আর এভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মতবাদ ও সভ্যতা হিসেবে সমাজতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটে। বর্তমানে রাশিয়া ও চীন সহ সকল সামাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেছে এবং নিজেদের কৃত্রিম শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা ও পূনরুদ্ধারের জন্যে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার আবরণে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে।

অতএব দুনিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র বলতে আজ আর কোনো কিছু নেই, যা কিছু আছে তাহলো দেশে দেশে কিছু প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্রী বা কম্যুনিষ্ট নামধারী ব্যক্তি। এরাও মূলত আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের সহায়ক শক্তি। এদের কাজ হলো মানবতার নব উত্থানের পথে আমেরিকার সহযোগী শক্তি হিসাবে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং পুঁজিবাদীদের সহায়তায় উন্নত ও বিলাসী জীবন যাপন করা। সুতরাং মানব

www.pathagar.com

জাতির জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ রচনায় সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহ এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে সমাজতন্ত্রী হিসেবে পরিচয়দানকারী ব্যক্তি ও গোষ্টীসমূহ কোনো প্রকার ইতিবাচক ভূমিকা রাখার অবস্থানে নেই। অবশ্য এদের মাঝে অনেক ব্যক্তি আছেন তারা সত্যিই মানব দরদী, মানুষের প্রকৃত মূল্য তারা বোঝেন, তাই তারা চান নির্যাতিত ও নিপিড়ীত মানুষ পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তি লাভ করুক। এক্ষেত্রে সমস্যা হলো তারা মুক্তির সঠিক দিক নির্দেশনা থেকে নিজেরাও বঞ্চিত এবং অন্যদেরকেও সে পথে চালিত করতে ব্যর্থ। তাদেরকে নাস্তিকতা পরিহার করে আস্তিকতার পথ ধরতে হবে আর তা শুধু কথায় নয় বাস্তব চিন্তা ও কর্মে।

সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের ফলে আমেরিকার নেতৃত্বে এক কেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বিশ্ব শক্তি হিসেবে খ্যাত ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান এমনকি চীনও বিশ্ব রাজনীতিতে আমেরিকার সহায়ক শক্তি। অন্যান্য উদীয়মান শক্তিও আমেরিকার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও প্ররোচনায় বিশ্ব শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার আকাংখা পোষণ করছে। চীন, ভারত, জাপান, জার্মানী যারাই বিশ্বশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে তাদের সবারই লক্ষ্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন। এসব উদীয়মান শক্তি কোনো কারণে বিশ্বের বিরাট অংশের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার লাভে সক্ষম হলেও তা স্থায়ী করার মতো কোনো আদর্শ বা সভ্যতা তাদের নেই যা তারা মানব জাতির উন্নয়ন, কল্যাণ ও সংহতি বিধানে কাজে লাগাতে পারে। ভারতের হিন্দুত্ববাদ নিজস্ব ভৌগলিক এলাকার বাইরে যার কোন আবেদন ও প্রভাব নেই। এছাড়া দেশটি হচ্ছে বর্ণবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার উর্বর ভূমি। চীন বিশাল জনসমুদ্রের দেশ। প্রাচীনকাল হতে একই স্থানে তারা প্রস্তর মূর্তির ন্যায় অবস্থান করছে। রাশিয়ার অনেক পরে ১৯৪৮ সালে এদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেলেও রাশিয়ার পতনের অনেক পূর্ব থেকেই তারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গ্রহন করে বিশ্ব অর্থনীতির অন্যতম শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স বিশ্বশক্তি হওয়া সত্বেও অস্তিত্ব চেতনায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের অংগ সংগঠন এবং দুনিয়াজোড়া আগ্রাসনে আমেরিকার অনুগামী।

আমেরিকা ও তার একান্ত আস্থাভাজন ইউরোপীয় রাষ্ট্র সমূহ এবং অস্ট্রেলিয়া নানা কারণে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও রাষ্ট্রের তুলনায় এখনো কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। পৃথিবী এখনও তাদের নেতৃত্বে চালিত হচ্ছে। বিশ্ববাসী বৈরিতা এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেরই অনুবর্তন করছে। হয়তো আরো কিছুকাল তাদের আজ্ঞাবহ থাকবে কিংবা থাকতে হবে। আর তাই মানব জাতির ভবিষ্যতের ভাবনা নিয়ে ভাবার আগে তাদের সুবিধার দিকগুলো ক্ষতিয়ে দেখা আবশ্যক।

www.pathagar.com

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র একটি গণতান্ত্রিক দেশ। এটি অভিবাসী সমন্বয়ে গঠিত অনেক জাতি ও সভ্যতার মিলন কেন্দ্র। জনগণের মতামত প্রকাশ ও ধর্ম পালনের অধিকার এখানে সংরক্ষিত। রাষ্ট্রের ক্ষমতার হাত বদল জনগণের ইচ্ছাতেই ঘটে থাকে। সমগ্র পৃথিবীর বেশীর ভাগ অর্থ সম্পদ তাদেরই মালিকানায় এবং বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রকও তারা। World Bank, IMF ইত্যাদি সংস্থার মাধ্যমে তারা শুধুমাত্র গোটা বিশ্বের অর্থনীতিকেই নিয়ন্ত্রণ করছেনা, নিয়ন্ত্রন করছে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে। বিশ্বের এক নম্বর সামরিক শক্তিও তারা এবং দুনিয়ার সমরাস্ত্রের শতকরা ৮০ ভাগ তারাই উৎপাদন করছে। দুনিয়ার বিভিন্ন উন্নত ও অনুন্নত দেশ তাদের তৈরী অস্ত্র দিয়েই একে অন্যের সংগে যুদ্ধ ও হানাহানিতে লিপ্ত হয়, আর অস্ত্র বিক্রীর টাকা তাদের কোষাগারে জমা পড়ে। অনুন্নত মুসলিম ও তৃতীয় বিশ্ব তেল বিক্রীসহ নানাভাবে যে অর্থ বিত্তের মালিক হচ্ছে তা এভাবে তাদেরই ঘরে ফিরে যায় এবং তাদের অর্থভান্ডার সমৃদ্ধ হয়। নতুন নতুন জ্ঞান-প্রযুক্তির উদ্ভাবকও তারা আর গোটা পৃথিবী এজন্যে তাদের মুখাপেক্ষী। তারা পৃথিবীকে যেমন শোষন করছে আবার পৃথিবীর যেকোন দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অভাব-দারিদ্রে তারা সাহায্যের হাত প্রসারিত করছে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র সমুদ্র দ্বারা সারা বিশ্ব থেকে সংরক্ষিত। অন্যেরা চাইলেও তাদের আক্রান্ত হওয়া সময় সাপেক্ষ। পক্ষান্তরে সারা বিশ্বে তাদের সামরিক ঘাঁটি বিদ্যামান এবং শত্রুর পাশাপাশি বন্ধুও আছে। মিডিয়াগুলি তাদের দখলে। এ ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনগণ তাদের বৈরী হলেও ক্ষমতাসীন শাসকগন তাদেরই সমর্থক।

আমেরিকার বাইরে তার বন্ধু রাষ্ট্র ও শক্তিসমূহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া ও জাপান আমেরিকার ন্যায়ই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তারা সবাই অর্থনৈতিক কারিগরী ও প্রযুক্তিগত ভাবে বিশ্বের উন্নততর শক্তি। এসব দেশেও কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মানুষের মতামত ও ধর্মাপালনে স্বাধীনতা বিদ্যমান। মিডিয়ার ক্ষেত্রেও তারা এগিয়ে। জনগণের জীবন মান উন্নত। সর্বাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার অধিকারী। অন্ন-বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা সহ নানা প্রকার মৌলিক মানবীয় আধিকার হতে অতি সামান্য অংশ বঞ্চিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নানা ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষ এসব দেশে স্বাধীনভাবে শিক্ষা গ্রহন করছে, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। এসবই আমেরিকা ও তার আস্থাভাজনদের সুবিধা, যেগুলি রাশিয়ানদের ছিল না এবং চীনা ও ভারতীয়দেরও নেই।

এতসব সুযোগ সুবিধার মাঝে লালিত পালিত হয়েও আমেরিকার নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্য সভ্যতা ধ্বংস ও পতনের মুখোমুখি। রাশিয়া এবং তার

www.pathagar.com

প্রভাবাধীন রাষ্ট্র সমূহের ধ্বংস ও পতনের জন্য যেমন কোনো বিদেশী আক্রমনের প্রয়োজন পড়েনি আমেরিকা ও তার অনুগামীদের ধ্বংস ও পতনের জন্যেও তার প্রয়োজন হবে না। তাদের উত্থানের মাঝেই পতনের বীজ নিহিত রয়েছে। এছাড়া দেশ বিদেশে তাদের নানামুখী কর্মকান্ড, মানবতার প্রতি তাদের অপরাধ এবং গোটা ইউরোপ ও আমেরিকাব্যাপী নৈতিক অবক্ষয়, সর্বোপরি যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপর তাদের সভ্যতার প্রাসাদ দাড়িয়ে তার বিপর্যস্ত অবস্থা অচিরেই তাদের পতন ডেকে আনবে এবং নেতৃত্ব থেকে তারা প্রাকৃতিকভাবে অপসারিত হবে।

আমরা ইতোপূর্বে জাতি ও সভ্যতার উত্থান পতনের নৃতাত্ত্বিক ও কোরআনী নীতিমালা আলোচনা করেছি। সে সব নীতিমালার আলোচনায় লক্ষ্য করেছি যে, যে কোন জাতি দুই শ্রেণীর মানুষের সমন্বয়ে গঠিত হয়। তাদের এক শ্রেণী হলো সাধারণ জনগন, আর অন্য শ্রেণী হলো বিশিষ্ট লোক বা বুদ্ধিজীবি মহল। সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা সংখ্যায় অধিক আর জাতির সংখ্যা শক্তিও এদের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু জাতির ভাগ্যোন্নয়ন, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি নিয়ে চিন্তাভাবনা, জ্ঞান-গবেষণা করার মত মেধা বা সুযোগ কোনটাই তাদের নেই। আর এ কারণে জাতির নেতৃত্ব, কতৃত্বও তাদের হাতে থাকে না। মূলত যারা জ্ঞান বিজ্ঞানে অগ্রসর, যাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করার মত শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা আছে, যারা অর্থ বিত্তের মালিক যে কোন সমাজকে তারাই নেতৃত্বদান করে আর সাধারণ জনগন তাদের নেতৃত্ব মেনে জাতি গঠনে নিজ নিজ অবদান রাখে। কোন জাতির আদর্শ, নেতৃত্ব ও জনগন যদি অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর উপর কতৃত্ব করার মত যোগ্যতা অর্জন করে তখন সেসব দেশের উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কতৃত্বই নয়। মানসিক ও নৈতিক আধিপত্যও প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এভাবে একটি সভ্যতা কোন নির্দিষ্ট জাতির গন্ডি পেরিয়ে বিশ্ব পরিমন্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। উদাহরনত আরব থেকে উত্থিত হয়ে ইসলামী সভ্যতা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিল, আর পাশ্চাত্য সভ্যতা ব্রিটেন থেকে শুরু হয়ে সারা বিশ্বে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এ প্রসংগে কোরআনের ঘোষণা ঃ "(সর্বোপরি) আমি তাদের দুনিয়ার মানুষদের নেতা বানিয়েছিলাম। তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সুপথ দেখাতো"। (আম্বিয়া ঃ ৭৩)

আল্লাহ তায়ালার এ ঘোষণাটি ইবরাহীম (আ) ও তাঁর সন্তানদের নুবয়াত ও নেতৃত্বদান প্রসংগে কোরআনে উল্লেখিত হলেও নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভের এটাই সাধারণ নীতি। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি, জাতি, গোষ্ঠী যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে গঠনমূলক কাজে ও ভালকাজে, মানবতার উন্নয়নে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখবে ততোক্ষণ তারা দেশ, জাতি ও বিশ্ববাসীর উপর নেতৃত্ব ও

www.pathagar.com

কর্তৃত্ব করবে। এ কারণেই অসংখ্য অধপাত ও পদস্খলন সত্বেও আমেরিকাসহ তার মিত্ররা বিশ্বময় কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন। আর আল্লাহর মনোনীত শ্রেষ্ঠ জাতি হয়েও মুসলমানরা বিশ্বময় নির্যাতিত এবং মানসিকভাবে তাদের গোলামী করছে কারণ তারা বস্তুগত ও অন্যান্য বিবেচনায় তাদের চেয়ে পিছিয়ে আছে। মুসলমানদের মধ্যে যেসব ব্যক্তি ইসলামী পূণর্জাগরণের জন্যে সচেষ্ট তারা ক্ষমতার মোহে অন্ধ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আক্রমণের শিকার আর এক্ষেত্রে আলেম নামধারী কিছু ব্যক্তিও তাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করছে।

আবার কোন জাতি, গোষ্ঠী বা সভ্যতার পতন নিকটবর্তী হলে, তখন তার বিকৃতির সূচনা হয় সে জাতির আলেম, জ্ঞানী, গুণি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা। অর্থাৎ প্রথম জাতির মাথায় পচন শুরু হয় আর এ পচন ক্রমান্বয়ে সাধারণ জনগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে গোটা জাতি কিংবা সভ্যতা নানা প্রকার গোমরাহী, ভ্রষ্টতা, অনৈতিকতা ও পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে, ফলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠে। এ প্রসংগে কোরআনের বাণী ঃ

"আমি যখন কোনো জনপদকে ধ্বংস করতে চাই তখন তার বিত্তশালী লোকদের আদেশ করি (নেক কাজের চর্চা করতে কিন্তু আমার আদেশ পালন না করে) সেখানে তারা গুনাহর কাজ করতে শুরু করে। (অতপর তাদের এই ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের ফলে) সেখানে আমার আযাবের ফয়সালা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। পরিশেষে আমি তাকে সম্পূর্ণরুপে বিধ্বস্থ করে দেই"। (বণি ইসরাইল ঃ ১৬)

আল-কোরআন এসব বিশিষ্ট লোকদেরকে 'মুতরাফিন' নামে অভিহিত করেছে। অর্থাৎ তারা এমন ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা নানাভাবে অনুগ্রহ দান করেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালার সাক্ষ্য অনুসারে চিরদিন এমনি ঘটে আসছে যে, প্রথমে এই মুতরাফিনরাই সমাজে খোদাদ্রোহিতা, পাপাচার, অনৈতিক কার্যকলাপ, অত্যাচার ও অবিচার শুরু করে। অতঃপর সমগ্র জনপদে তা ছড়িয়ে পড়ে। আমরা বনিইসরাইল জাতির উত্থান পতনের ইতিহাসে এ অবস্থা লক্ষ্য করেছি। বিশ্ব বিজয়ী মুসলমানদের পতন যুগে একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটতে আমরা দেখেছি। লুত জাতির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি আল্লাহ নৈতিক পদস্খলনের কারণে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন। ফেরাউন ও তার দলবলকে খোদাদ্রোহিতা, অহংকার ও জুলুমের কারণে সাগরে ডুবিয়ে মেরেছেন। নুহের জাতিকে প্লাবন দিয়ে ধুয়ে মুছে জগতের বুক থেকে সাফ করে দেয়া হয়েছে। আদ জাতির ভাগ্যেও একই পরিনতি ঘটেছে তাদের খোদাদ্রোহিতা, জুলুম ও ঔদ্ধত্যের পরিণাম স্বরুপ। শোয়েব নবীর জাতি মাদায়েনবাসীদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে তাদের প্রতারণামূলক আচরণ ও কাজের জন্য। তারা মানুষের নিকট থেকে পণ্য ওজন করে নেয়ার সময় বেশী নিতো

www.pathagar.com

এবং বিক্রয়ের সময় কম দিতো। এ অপরাধে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে আসমানী গজব দিয়ে ধ্বংস করে দেন। এভাবে আল্লাহ তায়ালা বণি ইসরাইলকে নানা ভাবে গোলামী, লাঞ্ছনা ও শাস্তির মুখোমুখি করেছেন এবং পরিশেষে মুসলিম জাতির উত্থানের মাধ্যমে তাদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্ব হতে উৎখাত করে মানুষের দয়ার উপর তাদের বেঁচে থাকা না থাকার ব্যবস্থা করেছেন।

আজকের বিশ্বমোড়ল আমেরিকা ও তার সহযাত্রী ইউরোপীয়গণের মাঝে অতীতে যেসব কারণে বিভিন্ন সভ্যতার পতন ঘটেছে তার সব কিছু বিদ্যমান। তাদের ব্যক্তি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় তৎপরতায় মানবতা বিরোধী, অনৈতিক, অশ্লীল ও খোদাদ্রোহিতামূলক এমন কোন বিষয় নেই যা মানুষের জন্যে শোভনীয়। তাদের সভ্যতা প্রাকৃতিক জগতে বিদ্যমান পশু সমাজের তৎপরতাকেও হার মানায়। নৈতিকতার প্রশ্নে তারা শুধু ব্যাভিচারীই নয় বরং এসব দেশের শতকরা ৫০/৬০ জন মানুষ ব্যাভিচারের ফসল। যৌন সম্পর্কের প্রশ্নে তারা লুত জাতির পর্যায়েতো পৌছেছেই অধিকন্তু তাদের গীর্জাগুলো সমলিংগের ব্যক্তিদের মধ্যকার যৌন সম্পর্কে বিবাহ নামক প্রহসনের স্বীকৃতি দান করেছে। সভ্যতার বিকাশ ও স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে জনসংখ্যাশক্তিও একটি মৌলিক উপাদান। কম সন্তান গ্রহন করায় এদিক থেকেও তারা পিছিয়ে পড়ছে। তারা হয়ে পড়েছে যন্ত্রনির্ভর ও বিদেশ নির্ভর। তাদের গোটা অর্থনীতি **'সুদ'** নামক হারাম ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। সারা বিশ্বকে তারা সুদী অর্থনীতি গ্রহনে বাধ্য করেছে এবং এ ব্যবস্থার মাধ্যমে শোষণ করছে। আগেকার রাজা বাদশাগন মনে করতো স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে জনগনকে শাসন করা তাদের স্বর্গীয় অধিকার। বর্তমানে আমেরিকা মনে করছে তার ও তার সতীর্থদের অধিকার হচ্ছে গোটা বিশ্বরাসীর উপর নেতৃত্ব কর্তৃত্ব করা। যারা তাদের অবাধ্য হবে তারা হলো শয়তানের মিত্র, তারা সন্ত্রাসী ও মৌলবাদী। ব্যক্তি হোক, সংগঠন হোক কিংবা রাষ্ট্র হোক তাদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। তারা নানা অজুহাত সৃষ্টি করে তাদের বিরুদ্ধবাদীদের নিপাত করে চলছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর তাদের এ তালিকায় স্থান পেয়েছে পৃথিবীর অর্ধ শতাধিক মুসলিম রাষ্ট্র ও ১৫৭ কোটি মুসলমান। ইতিমধ্যে তারা আফগানিস্তান ও ইরাক গ্রাস করেছে এবং বর্তমানে পাকিস্তানকে ছিন্ন ভিন্ন করার খেলা খেলছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোড়া ইসরাইলকে দিয়ে ফিলিস্তিনিদের ঘরছাড়া করেছে এবং আমেরিকা ও ইউরোপীয়দের প্রত্যক্ষ মদদে ইহুদীরা ফিলিস্তিনি ও আরবদের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধ শুরু করেছে। এ যুদ্ধের শেষ কোথায় কেউ জানেনা। ইউরোপ ও আমেরিকার রাষ্ট্র ও জনগন ইহুদীদের এ মানবতা বিরোধী কাজকে অন্যায় মনে করেও চোখ বুজে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। তারা ভুলে গেছে যে, সকল ক্রিয়ারই অনুরুপ ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

www.pathagar.com

এসব অন্যায় অবিচারের প্রেক্ষিতে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার দেশ ও জাতিগুলোর ধ্বংস হওয়াটাই সময়ের দাবী। কিন্তু প্রশ্ন হলো দুনিয়া পরিচালনার দায়িত্ব কাদের হাতে ন্যাস্ত হবে, কারা এ গুরু দায়িত্ব বহন করবে। যাদের কাঁধে এ দায়িত্ব অর্পিত হবে এ দায়িত্ব পালনের জন্যে তারা আদৌ প্রস্তুত কিনা? অথবা প্রস্তুত হলেও তাদের প্রস্তুতি কতটা অগ্রসরমান।

আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতার ধ্বংস আসন্ন। এ অবস্থায় অন্য একটি খোদায়ী পরিকল্পনার বিষয় চিন্তা করা যেতে পারে। আর তাহলো আল্লাহ তায়ালা যে কোন জাতি গোষ্ঠীকে ধ্বংস করার আগে তাদেরকে সংশোধনের জন্যে প্রচুর সময় ও সুযোগ দান করেন। তাদের মধ্যকার ভালো ও মন্দ লোকগুলিকে সত্য গ্রহন ও মিথ্যা বর্জনের পূর্ণাঙ্গ সুযোগ দান করেন। তিনি নানাভাবে বিপদ মুছিবত দিয়ে মানব জাতিকে সতর্ক করেন যাতে তারা অন্যায়ের পথ হতে ন্যায়ের পথে ফিরে আসে। ধ্বংসের পথ হতে হেদায়াতের পথে প্রত্যাবর্তন করে। আমরা বর্তমান ইউরোপ ও আমেরিকার দিকে তাকালে দেখতে পাবো সেসব দেশের মানুষের মাঝে ধর্মের ব্যাপারে নতুন দৃষ্টিভংগীর সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে জনগণ প্রতিবাদী হয়ে উঠছে। আমেরিকা ও ইউরোপের জনগন ও বুদ্ধিজীবিদের একাংশ আফগানিস্তান, ইরাক ও ফিলিস্তিনে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। বলগাহীন যৌনতা, জুলুম, শোষন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধেও শ্লোগান উঠছে। এ দিকের বিচেনায় তাদের বাপারে খোদায়ী নতুন সিদ্ধান্তও হতে পারে। এছাড়া আমেরিকা ও ইউরোপের দেশে দেশে অভিবাসন, চাকুরী, ব্যবসায় ও শিক্ষা উপলক্ষে প্রতি বছর বহু মানুষ গমন করছে। অনেকে স্থায়ীভাবে সে সব দেশে বসবাস করছে। আবার তাদের সংস্পর্শে অনেক ইহুদী ও খ্রিষ্টান নর-নারী ইসলাম গ্রহন করছে। এসব দেশে তারা ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ কায়েম করে চলেছে। ফলে প্রতিনিয়ত সমাজ, সামাজিকতা ও সংস্কৃতির রুপান্তর ঘটছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে অল্প দিনের মধ্যেই এসব দেশে ইসলাম এক অপ্রতিরোধ্য শক্তির রুপ লাভ করতে পারে। তাই স্বাভাবিকভাবে ইসলাম এসব দেশের রাষ্ট্রীয় ধর্মের রুপ পরিগ্রহ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে Rev. Bosworth Smith এর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য–"Islam is the most Complete, the most sudden and the most extraordinary revolution that ever Came to any nation on earth"_(Mohammad and Mohammadanism, London 1814, Page-151) অবশ্য এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ ভালো জানেন। আমরা অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাবো রাজ্য জয়ের মাধ্যমে ইসলাম যতটা না বিস্তৃতি লাভ করেছে তার চেয়ে বেশী বিস্তৃতি ঘটেছে বিভিন্ন ব্যবসায়ী

www.pathagar.com

কাফেলা, ধর্মীয় প্রচারকদলের প্রচার ও সংস্কৃতির আদান প্রদানের মাধ্যমে। আর এসব প্রক্রিয়া ইসলামকে সেসব দেশে স্থায়ী রুপ দান করেছে। পক্ষান্তরে ব্রিটিশ, ফ্রান্স, স্পেন, রাশিয়াসহ যারা শুধুমাত্র রাষ্ট্র দখল করেছে তাদের বিদায়ের সাথে সাথে পৃথিবীর কোথাও তাদের নাম চিহ্ন থাকেনি। আবার মঙ্গোলদের ন্যায় কিছু জাতি মুসলিম বিশ্বে আক্রমন চালিয়ে নিজেরাই ইসলাম গ্রহন করেছে। বর্তমানে বস্তুবাদী সভ্যতার পতনঘন্টা বাজার এ মুহূর্তে পৃথিবীর সকল দেশেই ধর্মীয় জাগরণের একটি আবহ সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইহুদী ও মুসলমান সবাই তাদের ধর্মের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন জাগছে সব ধর্মই কি নিজ দেশ ও জাতির সীমা পেরিয়ে বিশ্বময় মানব জাতির আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও বৈষয়িক চাহিদা মেটাতে সক্ষম। অতীত অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে তা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কোনো কর্মসূচী নেই। এসব ধর্ম কেবলই কতিপয় আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ। তাছাড়া তাদের কারো কাছে কোন ঐশী গ্রন্থ নেই যা আছে তা বিকৃত। কিন্তু মুসলমানদের রয়েছে মহাগ্রন্থ আলকোরআন, আর তা ইতিহাস পরিক্রমায় সকল ভুল ভ্রান্তির উর্ধ্বে অবস্থান করছে। এমনকি মানুষের জ্ঞানরাজ্যে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তার সবই কোরআনের বাণী দ্বারা প্রমানিত ও সমৃদ্ধ। এদিক থেকে হয়তো আল্লাহ তায়ালা ধ্বংসপ্রায় জাতিগুলোকে অর্থনৈতিক পতন, রাজনৈতিক বিপর্যয় ও সামাজিক বিশৃংখলার মাধ্যমে সত্য উপলব্ধির সুযোগ করে দিয়ে মহাসত্যের পথে আসার সুযোগ দিতেও পারেন।

ইসলাম ঃ

ইসলাম আল্লাহ মনোনীত ধর্ম বা জীবন বিধান। মহাগ্রন্থ আলকোরআনে আল্লাহ তায়ালা এ ধর্মকে পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ ধর্ম মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক সকল সমস্যার সমাধান পেশ করেছে। মানুষের বস্তুগত, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সকল দিক ও বিভাগের সাথে সমন্বয় করে এ জীবন বিধান রচিত হয়েছে। এটি একটি সুষম জীবনাদর্শ। একটি কালজয়ী আদর্শ। কালের বিবর্তনে মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্থান পতন ঘটেছে কিন্তু ইসলামী বিধানে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ইসলামী আদর্শের প্রধান উৎস পবিত্র গ্রন্থ আলকোরআন আজও সকল প্রকার ভূল ভ্রান্তি ও বিকৃতির হাত থেকে সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত।

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে ইসলাম তার আগমনের পর বিশ্ববাসীকে যে উন্নত সভ্যতা উপহার দিয়েছিল আজও তা পুরাপুরি সম্ভব। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতার পতন সম্ভাবনায় ইসলামী সভ্যতার পূণর্জাগরণ

www.pathagar.com

অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। কেননা পৃথিবী ও এর কোটি কোটি বাসিন্দা সম্পূর্ণভাবে আদর্শহীন থাকতে পারে না, তারা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ বঞ্চিত হয়ে আর কতকাল এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করবে। মহান আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য পরিহার করে আর কতকাল তারা মানুষ হয়ে মানুষের গোলামী করবে, খোদায়ীর মিথ্যা দাবীদারদের পূজা উপাসনা করবে। আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে আর কতকাল তারা আল্লাহর আইন ও বিধান পরিহার করে মানুষের তৈরী আইন দিয়ে শাসিত হবে, শয়তান ও তার অনুগামীদের পদাংক অনুসরণ করবে। আর কতকাল মানুষ নিজ নফসের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ থেকে নিজের ইহকাল ও পরকালকে বিপন্ন করবে। আর তাই পৃথিবীর সকল দেশে সকল সমাজে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট অংশের মাঝে বিবেকের দংশন শুরু হয়েছে। তারা নতুন কিছু প্রত্যাশা করছে আর তাদের এ প্রত্যাশার একমাত্র জবাব হলো ইসলাম।

আমি ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেছি ওহীর ধারায় সর্বশেষ ও সর্বাধুনিক জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম। এটি সকল নবীর শিক্ষার সার নির্যাস। ইতিপূর্বে ইহুদী, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্মের প্রাচীনতম প্রবক্তা এ ধর্মকে ইসলাম এবং এর অনুসারীদের মুসলিম নামে অভিহিত করেছেন। এ প্রসংগে কোরআনের বাণী ঃ "তিনি মানুষদের মধ্য থেকে তোমাদেরকেই মনোনীত করেছেন এবং এই জীবন বিধানের ব্যাপারে তোমাদের জন্যে কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি, তোমরা প্রতিষ্ঠিত থেকো তোমাদের আদি পিতা ইবরাহীমের দ্বীনের ওপর -- সে আগেও তোমাদের 'মুসলিম' নাম রেখেছিলো, এই কোরআনের মধ্যেও (তোমাদের এই নামই দেয়া হয়েছে, এ নাম তোমাদের এ জন্যেই দেয়া হয়েছে) যেন তোমাদের রাসুল তোমাদের (মুসলিম হওয়ার) ওপর সাক্ষ্য প্রদান করতে পারেন, আর তোমরাও (দুনিয়ার গোটা) মানব জাতির ওপর (মুসলিম হিসেবে আল্লাহর দ্বীনের) সাক্ষ্য প্রদান করতে পারো"। (আল হজ্জ ঃ ৭৮)

ইহুদী ও খ্রিষ্টানগণ ইবরাহীম (আ) কে তাদের পূর্ব পুরুষ হিসেবে স্বীকারও করে। এক্ষেত্রে তাদের সংগে মুসলমানদের নানা ক্ষেত্রে প্রচুর মিলও বিদ্যমান। মুসলমানদের ন্যায় তারাও কিতাবধারী। জেরুজালেম তিন ধর্মেরই পবিত্র স্থান। মুসলমানদের জন্যে তাদের জবাই করা খাবার খাওয়া বৈধ। আহলে কিতাব নারীদের বিয়ে করা মুসলমান পুরুষদের জন্যে জায়েজ করা হয়েছে। ফলে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতার স্থলে ইসলামকে জীবন দর্শন হিসেবে গ্রহন করা ইউরোপ ও আমেরিকানদের জন্যে অত্যন্ত সহজ এবং প্রকৃতির স্বাভাবিক দাবী। এ দিকের বিবেচনায় ইসলাম মানব জাতির আগামী দিনের ধর্ম ও আদর্শের প্রয়োজন পূরণে পুরোপুরি সক্ষম।

www.pathagar.com

ইসলামী সভ্যতা একটি জ্ঞানভিত্তিক সভ্যতা। কোরআনের প্রথম বাণী পড়ো অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করো। ইসলামের নবী - নবী মুহাম্মদের (সা) প্রধান মিশন ছিল একটি শিক্ষিত ও চরিত্রবান জনগোষ্ঠী নির্মাণ করা। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে ঘোষণা করেন ঃ "তিনিই সেই মহান সত্ত্বা, যিনি একান্ত সাধারণ জনগোষ্ঠী থেকে তাদেরই একজনকে রাসুল করে পাঠিয়েছেন। (যার দায়িত্ব হচ্ছে) সে তাদের আল্লাহর আয়াত সমূহ পড়ে শোনাবে, সেই আয়াতের আলোকে তাদের জীবনকে জাহেলিয়াত থেকে পবিত্র করবে, তাদের আমার গ্রন্থের কথা ও সে অনুযায়ী দুনিয়ায় চলার কৌশল শিক্ষা দেবে, অথচ এই লোকগুলোই রাসুল আসার আগে পর্যন্ত এক সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল"। -ইসলাম এখানেই ক্ষান্ত হয়নি বরং শিক্ষা গ্রহন নর-নারী সকলের জন্য ফরজ করেছে। শুধু সাধারণ জ্ঞানই নয় সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার প্রতি আলকোরআন উৎসাহিত করেছে। এদিক থেকে কোরআন হচ্ছে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক এবং মানবীয় ও খোদায়ী সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভান্ডার। অতএব কোরআনের জ্ঞানার্জনের আহবান এবং নবীর (সা) জ্ঞানের প্রশিক্ষনকে হাতিয়ার করে সোনালী যুগের মুসলমানগন বিশ্বজয় করেছে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্ববাসীর শিক্ষকের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিল। আজকের আধুনিক সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামী সভ্যতার কাছে বিশেষভাবে ঋণী। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট বারাক হোসেন ওবামা কিছুদিন আগে মিসরে মুসলিম বিশ্বের উদ্দেশ্যে দেয়া তার বক্তৃায় এই ঋনের সহজ স্বীকৃতি প্রদান করেন। রাসুলের (সা) ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান হলো মুসলমানদের হারানো সম্পদ। যেখানেই তা পাওয়া যাবে সেখান থেকে তা গ্রহন করতে তিনি নির্দেশ দান করেন। তাঁর জীবদ্দশায় চীন ছিল দূরবর্তী দেশ। জ্ঞানের প্রয়োজনে সে দেশে যেতেও তিনি নির্দেশ দান করেছেন। খ্রিষ্টানদের গর্ভে জন্ম নেয়া আধুনিক সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে পোপপাদ্রী ও গীর্জার বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। পক্ষান্তরে ইসলামের সোনালী যুগে মসজিদগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। অতএব নতুন নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সমৃদ্ধ আধুনিক সভ্যতা একমাত্র ইসলাম রুপ সাগরে অবগাহন করেই বিশ্ব সভ্যতার রঙ্গমঞ্চ হতে বিদায় নেয়া সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবধর্মী।

ইসলাম মানুষকে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা দান করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি, আর জন্মগত ভাবেই সে স্বাধীন ও মুক্ত। তার কোন দায়বদ্ধতা থাকলে তা রয়েছে একমাত্র আল্লাহর নিকট। সে তার চিন্তা ও কর্মের জন্যে একমাত্র আল্লাহর নিকট দায়বদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা তাকে সৃষ্টি করে হক ও বাতিল অর্থাৎ সত্য ও ভ্রান্ত দু'টি পথের দিশা দান করেছেন। সে চাইলে

www.pathagar.com

সত্যের পথে চলতে পারে আর চাইলে মিথ্যা অর্থাৎ শয়তানের পথের অনুগমন করতে পারে। এ প্রসংগে কোরআনের ঘোষণাঃ "আমি তাকে এ দুনিয়ায় চলার পথ দেখিয়ে দিয়েছি, এখন সে চাইলে হেদায়েতের পথে চলে আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দাহ হতে পারে, আবার চাইলে বিরোধীতার পথে চলে অকৃতজ্ঞ ও কাফের হয়ে যেতে পারে"। অতএব ইসলাম মানুষকে অধিকার দিয়েছে, তাকে যেকোন মত ও পথ গ্রহনের স্বাধীনতা দিয়েছে। সে চাইলে আস্তিক হতে পারে, আবার চাইলে নাস্তিক বা কাফেরও হতে পারে। অবশ্য দুই পথের পরিণতি সম্পূর্ণ ভিন্ন যা তারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে ভোগ করবে। এ দিক থেকে ইসলাম মানব জাতির ভবিষ্যত প্রত্যাশার স্থল। সমাজতন্ত্র অন্য কোন মতকে সহ্য করেনি, শক্তি প্রয়োগে উৎখাত করেছে। বর্তমান গণতন্ত্রের ফেরিওয়ালারাও নিজের দেশের বাইরে অন্য কোন দেশে তাদের চিন্তার বাইরে কোন দল বা ব্যক্তিকে নির্বাচিত করলে তারা তাকে স্বীকার করে না বরং শক্তি প্রয়োগে উৎখাত করে। উদাহরণত আলজেরিয়া ও ফিলিস্তিনের জনগনের গণতান্ত্রিক রায়।

বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে জনপ্রিয় সরকার ব্যবস্থা হলো গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতি। ইসলামী সরকার ব্যবস্থার সংগে এ ব্যবস্থার যথেষ্ট মিল দেখা যায়। ইসলামী সরকার ব্যবস্থা একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক সরকারের ন্যায় এ ব্যবস্থায়ও জনগণের মতামতের ভিত্তিতে সরকার নির্বাচন ও পরিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে জনমতের মূল্য খুব বেশী। কোন সরকার কোন কারণে স্বৈরাচারী হয়ে উঠলে পরবর্তী নির্বাচনে তাকে ক্ষমতা হারাতে হয়। এক্ষেত্রে ইসলামও আধুনিক সভ্যতার মাঝে মিল খুজে পাওয়া যায়।

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পদের উপর জনগণের মালিকানা স্বীকার করে। ইসলামও মালিকানার ক্ষেত্রে অনুরুপ ধারণা পোষণ করে। এক্ষেত্রে পার্থক্য হলো ইসলাম সম্পদের এক কেন্দ্রিকতার পরিবর্তে বিকেন্দ্রীকরণ পছন্দ করে এবং শুধুমাত্র বৈধ পন্থায় সম্পদের মালিকানা অর্জনকে সমর্থন করে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম অর্জিত সম্পদের যাকাত দান অপরিহার্য করেছে। এটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনবীমা। সুদসহ সকল শোষণমূলক আর্থিক লেনদেন ইসলামে নিষিদ্ধ। খ্রিষ্টান ধর্মেও তা নিষিদ্ধ ছিল। বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র সুদী ব্যাংক বীমার পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংক বীমা অধিকতর লাভজনক প্রমাণিত হওয়ায় পাশ্চাত্য জগতও এ ব্যবস্থা চালু করছে। আবার শুধুমাত্র ইসলামী ব্যাংক ও বীমা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং জনগণের মাঝে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। অতএব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আধুনিক সভ্যতার সংগে ইসলামের পার্থক্য কমে আসছে।

www.pathagar.com

বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইসলাম বিশ্বের দরবারে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আইনের দৃষ্টিতে রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র সকলে সমান। ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার সকলের রয়েছে। আধুনিক বিচারব্যবস্থা বহুলাংশে ইসলামী বিচার ব্যবস্থার আদর্শে গড়ে উঠেছে।

ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরন করে থাকে। আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান অধিকার ভোগ করে। সকল ধর্মের মানুষের নিজস্ব ধর্মপালন, ধর্মশিক্ষার অধিকার এখানে স্বীকৃত। এক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য সভ্যতা ইসলামকে অনুকরণ করতে পারে।

এভাবে আলোচনা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতার ব্যর্থতাগুলির যায়গা একমাত্র ইসলামই পূরণ করতে সক্ষম। এছাড়া ইসলামের আরও কিছু বাড়তি সুবিধা রয়েছে। তার একটি হলো ইসলাম সদা সম্প্রসারণশীল একটি ধর্ম। যেখানেই মুসলমানদের বাস সেখানেই মসজিদ গড়ে উঠছে। আর মসজিদগুলোতে শুক্রবার অথবা অন্য সময়ে যখন মুসলমানগণ জামাতে নামাজ পড়ে তখন যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রকাশ ঘটে তা দেখে বর্ণ শ্রেণীতে বিভক্ত মানব গোষ্ঠী ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ইসলাম গ্রহন করে। এভাবে ইসলাম পৃথিবীর আনাচে কানাচে সকল জাতি গোষ্ঠীর ধর্মে পরিণত হতে চলেছে।

বিশ্বব্যাপী ইসলামী সভ্যতার পূনর্জাগরণে অন্য একটি সুবিধা রয়েছে আর এটাই সবচেয়ে বড় সুবিধা। তাহলো এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার যেসব দেশে সভ্যতার উত্থান পর্বে মুসলমানগণ নিজেদের রাজত্ব বিস্তার করেছিল প্রায় সবদেশে মুসলমানরা আজও সংখ্যাগরিষ্ট। এ ধরণের স্বীকৃত মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যা ৫০ এর উর্ধ্বে। এসব রাষ্ট্র ছাড়া অনেক অমুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে যেগুলোর উল্লেখযোগ্য মানুষ মুসলমান, যেমন ভারতে প্রায় ২০ কোটি মুসলমানের বাস। চীন, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানীসহ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে বিপুল সংখ্যক মুসলমান বাস করছে। সেসব দেশে নানা প্রতিকুলতার মাঝেও মুসলমানরা নিজস্ব কৃষ্টি ও সভ্যতা বজায় রেখে চলার চেষ্টা চালাচ্ছে। এ প্রসংগে আরো জানা থাকার প্রয়োজন যে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলি প্রায় পাশাপাশি অবস্থান করছে। অন্য কোন দেশের মাটিতে পা না রেখেই এসব দেশের একটি থেকে অন্যটিতে যাতায়াত করা যায়। কেননা এসব দেশ একই খেলাফাতের অধীন ছিল। কা'বা কেন্দ্রিক খিলাফাত কায়েম হলে মুসলমানদের দেশগুলি একত্রিত হয়ে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ও অজেয় সাম্রাজ্যে রুপ নেয়ার শতভাগ সুযোগ ও সম্ভাবনা বিদ্যমান। আর প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে যা বুঝায় তারও

www.pathagar.com

বেশীর ভাগ মুসলিম দেশ সমূহে বিদ্যমান। মুসলমানদের এই ভৌগলিক সুবিধাজনক অবস্থান পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারকদের মাথাব্যথার অন্যতম কারণ, আর তাই নানা অজুহাতে তারা মুসলিম বিশ্বকে বিভক্ত করে রাখছে এবং মুসলমানরা তাদের টেবলেট খেয়ে আরব-অনারব, শিয়া-সুন্নী ইত্যাদি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে আছে।

আশার কথা হলো মুসলমানরা তাদের ভূল বুঝতে শুরু করেছে। ভেড়ার পালে বড় হওয়া সিংহ নিজের চেহারা দেখতে না পাওয়ায় নিজেকে ভেড়া মনে করতে থাকলো। মুসলমানদেরও হয়েছে সে অবস্থা। কিন্তু এখন তারা আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখতে শুরু করেছে। নিজেদের সোনালী যুগ ও বর্তমান দুরবস্থার কাহিনী জানতে সচেষ্ট হচ্ছে। তারা শিকড় সন্ধানী হয়ে উঠেছে। তারা নতুন করে ইসলাম ও কোরআনকে জানার জন্যে উদ্যোগী হচ্ছে। আধুনিক জ্ঞান-গবেষনার সংগে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের তুলনামূলক অবস্থা বিচার করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানে অগ্রসর হচ্ছে। এক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের তুলনায় আধুনিক শিক্ষিত নরনারী অগ্রনী ভূমিকা পালন করছে। ফলে ইসলাম বিরোধী শক্তি মোল্লাতন্ত্র অপবাদে ইসলামকে খুব বেশী অবজ্ঞা করার সাহস পাচ্ছে না। এমতাবস্থায় যা প্রয়োজন তাহলো মুসলিম বিশ্বের ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেমদের ঐক্যবদ্ধভাবে নিজেদের মধ্যকার দলগত ও ফিরকাগত পার্থক্য দুর করে একটি একক মঞ্চে সমবেত হওয়া। আর তা হওয়া দরকার কোরআনের ঘোষণা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে।

"এভাবে আমরা তোমাদেরকে এক ন্যায়পরায়ন ও মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি যাতে তোমরা লোকদের ওপর তত্ত্বাবধানকারী হও আর রাসুল তোমাদের প্রতি তত্ত্বাবধানকারী হোন"। (আল বাকারা ঃ ১৪৩)

'তোমরাই সর্বোত্তম জাতি। তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে লোকদের কল্যাণের জন্যে তোমরা লোকদেরকে সুকৃতির আদেশ দাও এবং দুস্কৃতির প্রতিরোধ কর আর আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান পোষণ কর।" (আল ইমরান ঃ ১১০)

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকা উচিত। যারা লোকদেরকে কল্যাণের দিকে ডাকবে, সুকৃতির আদেশ দেবে ও দুস্কৃতির প্রতিরোধ করবে।" (আল ইমরান ঃ ১০৪)

মহাগ্রন্থ আলকোরআনের উপরোক্ত আয়াত সমূহে মুসলিম জাতির উত্থান ও টিকে থাকা এবং বিজয়ের কর্মসূচী ও নীতিমালা ঘোষিত হয়েছে। উক্ত ঘোষণার আলোকে সমগ্র দুনিয়ায় কর্মকান্ড চলছে। কোন বাধা প্রতিবন্ধকতাই মুসলমানদের নবজাগরণের এ ধারা প্রতিহত করতে পারবেনা। আর আল্লাহর

www.pathagar.com

ওয়াদা অনুযায়ী দুনিয়ার শাসন ক্ষমতা তাদের জন্যেই অপেক্ষমান। এ প্রসংগে কোরআনের ঘোষণা ঃ

"তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব (রাষ্ট্র ক্ষমতা) দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদাত করবে, আমার কোন শরীক করবে না।" (সূরা নূর ঃ ৫৫)

আল্লাহর এ প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ইসলামই মানব জাতির ভবিষ্যত আদর্শ। প্রিয় নবীর (সা) একটি ভবিষ্যত বাণী দিয়ে এ আলোচনার ইতি টানছি। যদিও ভবিষ্যৎ বাণীগুলো মুসলিম, তিরমিজি, ইবনে মাজা, মুসতাদরাক প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, তবুও ইমাম শাতবী (র) এর **'মাওয়া ফিকাত'** কিতাবে এবং মাওলানা ইসমাইল শহীদ (র) তার **"মানসবে ইমামত"** কিতাবে যে হাদিস বর্ণনা করেছেন এখানে তার উল্লেখ কল্যাণকর হবে। হাদীসটি হলো ঃ

"তোমাদের দ্বীনের শুরু নবুয়্যাত ও রহমতের মাধ্যমে এবং তা তোমাদের মাঝে থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ চান। অতঃপর মহান আল্লাহ তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর নবুয়্যাতের পদ্ধতিতে খিলাফত পরিচালিত হবে যতদিন আল্লাহ চান। অতঃপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নেবেন। তারপর শুরু হবে দুষ্ট রাজতন্ত্রের যুগ এবং যতদিন আল্লাহ চাইবেন, তা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তারপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নেবেন। অতপর জুলুমতন্ত্র শুরু হবে এবং তাও আল্লাহ যতদিন চাইবেন, ততদিন থাকবে। অতপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নেবেন। অতপর আবার নবুয়্যাতের পদ্ধতিতে খিলাফত কায়েম হবে। নবীর সুন্নাত অনুযায়ী তা মানুষের মধ্যে কাজ করে যাবে এবং ইসলাম পৃথিবীতে তার কদম শক্তিশালী করবে। সে সরকারের ওপর আকাশবাসী ও দুনিয়াবাসী সবাই খুশী থাকবে, আকাশ মুক্ত হৃদয়ে তার বরকত বর্ষণ করবে এবং পৃথিবী তার পেটের সমস্ত গুপ্ত সম্পদ উদগীরণ করে দেবে।"

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থ সমূহ ঃ

১। বিশ্ব সভ্যতা --- এ, কে, এম, শাহনাওয়াজ।

২। সভ্যতার ইতিহাস --- ডঃ এ, এম, আমজাদ।

৩। মানুষের উৎপত্তি ও জাতি সমূহের সৃষ্টি ---- খন্দকার মাহমুদুল হাসান।

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

* আত্মশুদ্ধি।
* আলকোরআনের আলোকে মুমিন জীবনের বৈশিষ্ট্য।
* আলকোরআনের আলোকে মানুষ ও মানুষের শেষ পরিণতি।
* জীবন সমস্যার সমাধানে আলকোরআন।
* গল্প নয় সত্যকথা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

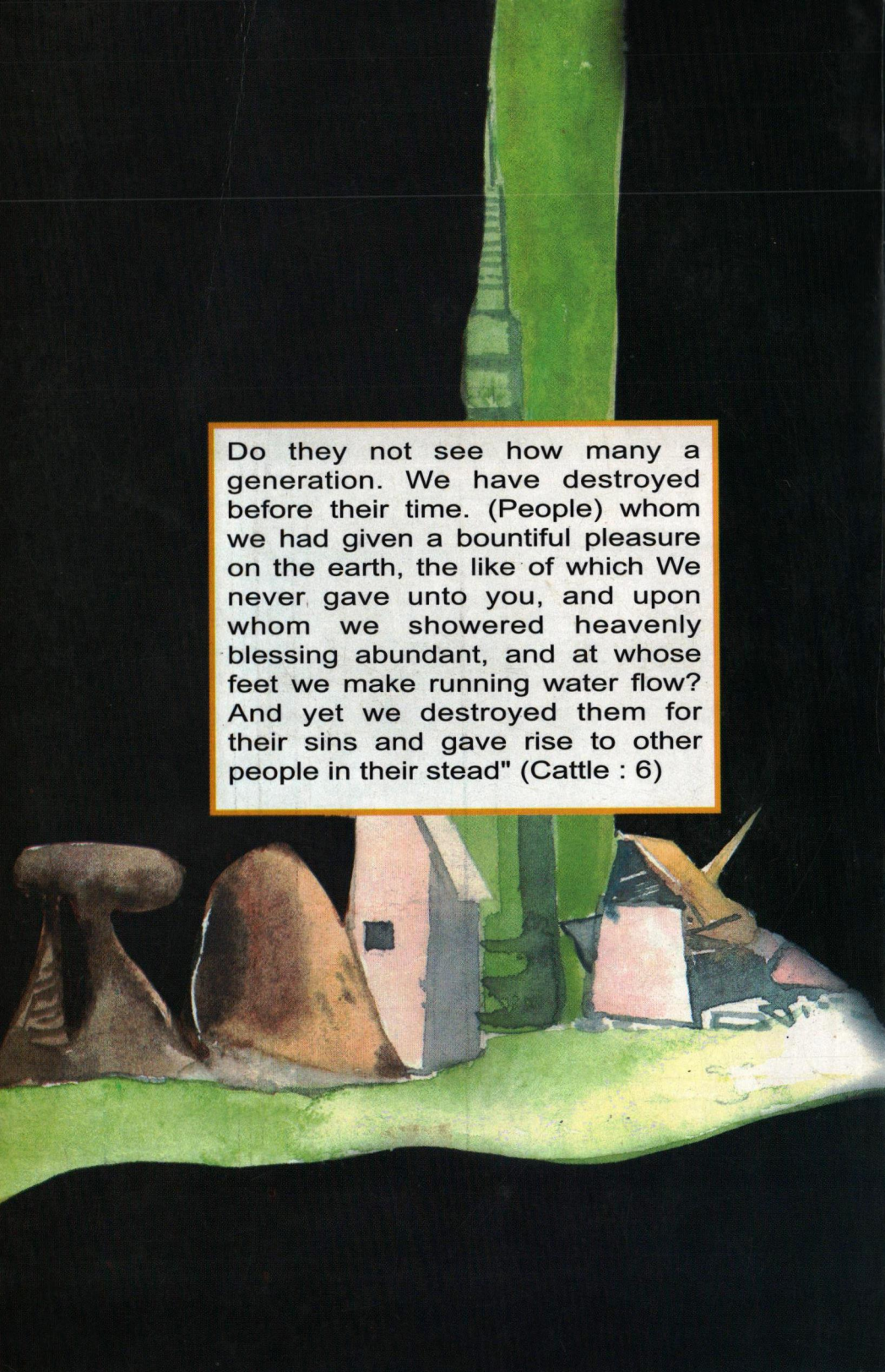
Do they not see how many a generation. We have destroyed before their time. (People) whom we had given a bountiful pleasure on the earth, the like of which We never gave unto you, and upon whom we showered heavenly blessing abundant, and at whose feet we make running water flow? And yet we destroyed them for their sins and gave rise to other people in their stead" (Cattle : 6)